শুদ্ধপ্রাণা হীরাদেবীর
পবিত্র স্মৃতির
উদ্দেশে

সূচীপত্র :

লেখার জন্য লেখা

কি লিখ্‌বো, কেমন করে লিখ্‌বো, কেউ-কি তা আগে থেকেই জানে, না জেনে নিতে পারে। অথচ আশ্চর্য, তবু লিখতে হয়, যা বলবার তা বলতে হয়, সুন্দর ক'রে গুছিয়ে-গাছিয়ে। এই যে আমি বসে বসে লিখছি, আমার হাতের কাছে পড়ে আছে হাক্সলির প্রবন্ধের বই, এমারসনের চিন্তারাজ্য, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আর একটু দূরে এক আলমারী ভর্তি বই, এগুলো সব না হ'লে কি চলতো না; আর কী এমন ক্ষতি হতো যদি আমি হঠাৎ খেয়ালখুশি মতো একটা কিছু লিখতে না বসতাম! যারা পেট পুরে খায়, দিনভোর আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, তারা তো বেশ আছে, দিব্যি আনন্দে আছে, তবে কী এমন তাগিদ ছিলো মাইকেল মধুসূদনের কাব্যরচনায় হাত দেবার। ব্যারিস্টার মানুষ, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, চেষ্টা করলে কি সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করবার মতো অর্থোপার্জন করতে তিনি আর না পারতেন! কিংবা তাইবা কেন, এত বড়োলোকের ছেলে, ইচ্ছে করলেই তো কিছু না করে দিব্যি আরামে খেয়ে-শুয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু পারলেন না তো। কে কান্না জুড়ে দিয়েছিলো রবীন্দ্রনাথকে কবি-সাহিত্যিক হওয়ার জন্য? কেউ না। তবু তো তিনি হলেন; ইচ্ছা ক'রে যেচে শত্রু তৈরী করলেন এক পাল। অথচ দ্বারকানাথের নাতি, কলকাতা শহরের অনেক অনেক বড়লোকের অমানুষ ছেলেদের মতো, দামী-দামী মদের বোতল সাবাড় ক'রে নিত্যি-নতুন গাড়ী চড়ে আর যত্র-তত্র চলাফেরা ক'রে, পারতেন নাকি আশী বছরের জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে? ক' গ্যালন মদ আর পেট্রল খরচ হতো তাতে, ইংরেজ আমেরিকা তো ব্যবসায়ীর জাতই।

কিন্তু না; আনন্দ পাওয়ার পথে তাঁরা গেলেন না। বুকভরা ব্যথা নিয়ে আনন্দ দেওয়ার ভার নিলেন তাঁরা ইচ্ছে ক'রে, যেচে; কারো অনুরোধে নয়, উপরোধে নয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ে মরতে হয় হোক না, চিরন্তন জীবনের সন্ধান যে পেয়েছে, তুচ্ছ মরজীবনের অভাব দুর্ভাবনাকে সে কেয়ার করে তো ভারি। শুনেছি ইবসেন নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, অথচ কি অদ্ভুত লাগে ভাবতে, এই ইবসেন না জন্মালে গ্রেটা গার্বোকে হয়তো সারাজীবন রাঁধা-বাড়া আর কাঁথা শেলাই করেই কাটাতে হতো, হয়তো মিস মেয়ো ঘেড়াটোপ দেওয়া গাড়ী চ'ড়ে বড় জোর মাইলখানেক দূরের বান্ধবীর বাড়ী পর্যন্ত বেড়াতে যেতে পারতেন, ভারতবর্ষে আসবেন কি, বাবা-কাকাদের মুখে ইণ্ডিয়ার নাম শুনে হয়তো বুঝতেই পারতেন না, ওটা কেক না নতুন ডিজাইনের কোনো টুপী বা গাউনের নাম। সমস্ত য়ুরোপ-আমেরিকার চোখ ফুটিয়ে দিয়েও তো শেষটায় ইবসেন নিজেই অ-জ্ঞান শিশুর মতো হয়ে রইলেন। এত দুঃখ, এত ব্যথা, তবু আনন্দ বিলোনোর সুখ, তবু জীবনকে জীবন-মৃত্যুর অতীতরূপে পাওয়ার আকাজ্ক্ষা!

হৃদয়ভরা দুঃখ থেকে জন্ম এই সুখের, এ-সুখ এ-আনন্দ তাই বিষাদবিমল। সৃষ্টির জন্মরহস্য কত গভীর, কত অজ্ঞাত, তাকে বুঝতে হবে, সুন্দরের লীলানিকেতন কোন্ কুৎসিততম পরিপার্শ্বের অভ্যন্তরে, তাকে জানতে হবে, সত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী কোন আকাশকে আলোকিত করে তাকে খুঁজতে হবে; এ-যে কি আবিষ্কার, কি রূপসন্ধান তার পরিচয় অনির্বচনীয়। কবি কি নিজেকেই জানে সম্পূর্ণ করে তার ছোট্ট বুকের অভ্যন্তরটাই যে একটা বিরাট রহস্যের খনি, তাকেও জান্তে হবে না? সেই-যে মানুষটা কাকভোরে ঠেলাগাড়ী নিয়ে বেরুলো কিংবা বেরুলো রিক্সা ঠুং ঠুং করতে করতে, ফিরবে সেই কখন রাত বারোটার পর, যখন রাত্রির নিস্তব্ধতায় দিক দিশা মূক, যখন নগ্ন নির্জন রাস্তাগুলোর ধারে ধারে দীর্ঘঋজু ল্যাম্পপোষ্টগুলোকেও ভয়

কাতর ব'লে মনে হয়, তার সঙ্গে তোমার আমার অমিল কোন খানটায়? তুমি বড়লোক আর সে গরীব; তুমি বই-পড়া বিদ্যার জাহাজ আর সে বই-না-পড়া অবিদ্যার সমুদ্রতলে; তুমি লণ্ড্রী-ধোয়া দুধসাদা জামাকাপড় পরে বাইরে বেরোও, আর ঘরেই কি বাইরেই কি ঘরে-কাচা ফতুয়া ধুতিই ওর সম্বল। এই তো? কিন্তু এ সবই যে বাইরের জিনিস। বেশী টাকা খরচ করে তুমি না হয় বেশী খাও, কিন্তু সেও তো ম'রে প'ড়ে নেই; তুমি হয়তো অনেক বই পড়ে মস্ত পণ্ডিত হয়েছ, তাই বলে কি ওর জীবনের সমস্ত জ্ঞানই তুমি আয়ত্ত করতে পেরেছ? না, এ অমিলটা সব নয়। যে অন্তরমহলকে চোখে দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়, সেইখানেই — শুধু সেই অন্তরমহলেই তোমার আমার সঙ্গে ঐ ঠেলাওয়ালার, ঐ রিক্সাওয়ালার সমান অধিকার। তোমার মেয়েটা যখন কাতর হয়ে জ্বরের ঘোরে বিকার ডেকে চলেছে, পাখীর পালকে বোনা বিছানায় শুয়ে তুমি কি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পার? পারো না। ছাদে দাঁড়িয়ে দেখোনি কি, কোন বিনিদ্র রাতে তোমার বাড়ীর পাশের পেভমেণ্টের ওপর ছটফট ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা কী এক অসহ্য যন্ত্রণায়, অব্যক্ত নির্মম উৎকণ্ঠায়। সে কেন? হেকিমি চিকিৎসায় কিছু হলো না; কুপি-জ্বালা আধো অন্ধকার ঘরে তারই মতো ছট্‌ফট্ করছে ছোট্ট কচি মেয়েটা, বাঁচবেনা বোধ হয়। আর, এই যে সেদিন টেলিগিরাফের কথা লিখিয়ে দেবার জন্য সবিনয়ে এসে দাঁড়াল ফর্ম হাতে নিয়ে বাইরে, সে কিসের জন্য। আজ কুড়িদিনেরও বেশী তার জরুটা গেছে মুলুকে, একটা পৌঁছ সংবাদ পর্যন্ত এলো না, তাই না এত ব্যগ্রতা। এ-উৎকণ্ঠা কি তুমিও কোনদিন অনুভব করোনি মনে-প্রাণে তোমার স্ত্রীর জন্য, তোমার প্রিয়ার জন্য। তা হলে আর অমিল কোনখানটায়? হৃদয় নিভৃতিতে দৃষ্টি রাখো, দেখবে, কী বিবিড় অতল রহস্যে ভরা সে অলকাপুরী। কতোটুকু জানো তার। কত ব্যথা-বেদনার বিনিময়ে কোন্ মূল্যে তাকে কেনা যায়

তা-কি জানো ?

কবি তা জানে, সাহিত্যিক তা জানে, জানে যে শিল্পী, যে স্রষ্টা। তাই এ বেদনাবিষকে নীলকণ্ঠের মতো গিলে ফেল্‌তে তাঁর বাধে না। যদি জিজ্ঞেস করো এ-সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের অর্থ কি, কি লাভ তাতে, আমি বল্‌বো, অনাসৃষ্টির হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্যই তাঁর এ দুস্তর তপস্যা, এ আত্মনিয়োগ। যুগ যুগ সঞ্চিত সভ্যতা তো ধ্বংসের পাশাপাশি দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় মুখোমুখি হয়ে। এইজন্যই না একদা বিশ্ববিজয়ী রোমসভ্যতা ভারতসভ্যতার কাছে ম্লান, এইজন্যই না তৈমুরলঙ্‌ নাদির শা সম্রাট অশোকের প্রতিভার কাছে স্তিমিত নিস্তেজ। মৃত্যুর মধ্যে জীবনের জয়গান গায় যারা তারা মরণজয়ী, তাই মর-জীবনের হাতছানিকে তারা উপেক্ষা করে চল্‌তে পারে, বল্‌তে পারে শৃন্বন্তু বিশ্বে।

কি লিখবো, কেমন ক'রে লিখবো তা জানার দরকার নেই, কেন লিখবো তা যদি বুঝতে পারো, যদি জান্‌তে পারো হৃদয় কার নাম, তা হলে তোমার সহজ কথাই হবে কবিতা, হবে সাহিত্য। কেমন করে তা হলো সে অলৌকিক রহস্যতলের সন্ধান করে লাভ কি। মানুষ বাঁচুক, পৃথিবী বেঁচে উঠুক বার বার মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

শিল্পপ্রত্যয়

ছোট হোক, বড় হোক, কিছু-না-কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকে মানুষ। বস্তুত এই কামনাটুকু না থাকলে তার বেঁচে থাকার কোন অর্থই থাকতো না। জেলে-মাঝি-মাল্লা থেকে শুরু করে রাজধানীর সবচেয়ে বনেদী পাড়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিটি পর্যন্ত এই কামনার দাস। অন্যপক্ষে এ আশা-আকাঙ্ক্ষারও শেষ নেই। শেষ পরিতৃপ্তি মানেই তো মৃত্যু। তাই ইপ্সিত কামনা যখনই সার্থকতায় মূর্ত হয়ে ওঠে তখনই তো সে আবার অন্য কোনো চেহারায় মানুষের চেতনাকে হাতছানি দেয়। সব ইচ্ছাই যে পূর্ণ হয় মানুষের তাও নয়। অনেক সময়েই তাকে আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় বলে হায়-আফশোষ করতে হয়। তবুও তা একেবারেই সাময়িক ঘটনা মাত্র। তবে একটা বাঁচোয়া এই যে আমরা সাধারণত আমাদের ইচ্ছাটাকে, তা যত বড়ই হোক না, বন্দী রাখি আপন-আপন অধিকারের মধ্যে, এবং জীবনের ক্ষুদ্রতম সার্থকতাটুকুও সম্ভব এইজন্যই। না হলে শুধু বেঁচে থাকার অর্থসন্ধান তো দূরের কথা, বাঁচাটাকেই একটা অনর্থ ব্যাপার বলে মনে হতো।

আরও স্পষ্ট কথায় মানুষ যশোলিপ্সু। সে তার ব্যবহারিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই হোক, কি সমগ্র পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ মানবসমাজেই হোক। পরস্পরনির্ভর দুটি প্রবাদবাক্য এখানে মনে রাখা চলে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদি না থাকে তবে মানুষ বড় হতে পারে না, আর সাময়িক বিফলতা অনিবার্য সফলতারই সোপানমাত্র।

ছুটিকে একদৃষ্টিতে দেখলে বলা যেতে পারে, সংসারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তার মানে অনেক বাধাবিপত্তির বেড়া ডিঙিয়েই মানুষকে তার কাঙ্ক্ষিত সফলতার দিকে এগুতে হয়। আমার এ-উক্তি একটি নতুন আবিষ্কৃত সত্য, এমন কথা আমি সরবে জাহির করতে চাই না, কেন-না এ-সত্য বহুযুগ ধরেই বহু মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে আসছে। কিন্তু সাধারণ সংসারী যাঁরা, তাঁরা কি কখনও অন্যমনস্ক হয়েও লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা যা চান তা সত্যিই তাঁদের প্রতিনিয়ত একটা যন্ত্রণার মতো পীড়ন করে চলেছে কিনা। তাঁরা ভাগ্যবান, দৈনন্দিন জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে তাঁদের আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন একাকার হয়ে মিশে যেতে পারে। তাই এ দুর্ভোগও সর্বক্ষণ ভোগ করতে হয় না। তা'ছাড়া ব্যবহারিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা একজন মানুষের ব্যক্তিজীবনেই আবদ্ধ। তার সুখ, তার দুঃখ, তার একার। সে-সুখের ভাগীদার যেমন নয় তার প্রতিবেশী, তেমন সে-দুঃখের অংশীদারও সে নয়। পারস্পরিক ঈর্ষার সংঘাত হয়তো কিছু আছে, কিন্তু তা এতই সঙ্কীর্ণ পটভূমির ব্যাপার যে বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রে তার কোন চিহ্নকেও কেউ বড় একটা উপলব্ধি করতে পারে না।

সামাজিক জীবনের বৃহৎ স্বার্থের সঙ্গে যে জড়িত তাকে কিন্তু এ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে ভুল দেখা হবে। সেখানে একের ইচ্ছা অন্যকে প্রণোদিত করে। একের নৈরাশ্যে অন্যে বিড়ম্বিত হয়। সুতরাং বৃহৎ কিম্বা বলা উচিত মহৎ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগতভাবে একটি মাত্র মানুষকে বিচলিত করলেও তার প্রভাব অবধারিতভাবে সমাজের আরো অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে ধীরে ধীরে, কখনো-বা আশ্চর্যরকম দ্রুতগতিতে, সঞ্চারিত হয়ে যায়। কি সাহিত্য-শিল্প কি রাজনীতির চিন্তায়। আজ যে সমগ্র পৃথিবীর চিন্তাধারায় একটা অস্বস্তিকর আলোড়নের হাওয়া বয়ে চলেছে, তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তার জন্য বিশেষ কয়েকটি দেশকে দায়ী করলেই যথেষ্ট হবে না। যদি একটু ভেতরে প্রবেশ

করা যায়, দেখা যাবে কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাই সেখানে সক্রিয়-ভাবে কাজ করে চলছে। সে-ইচ্ছা সৎও হতে পারে দুষ্টও হতে পারে। এখানেও কথা আছে। সৎ কি অসৎ তাও বিচারসাপেক্ষ। এই যে পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন তা এই বিচারেরই মহড়া তো!

সাহিত্য শিল্পকেই বিষয় করে ববং আলোচনায় নামা যাক। শিল্প-সৃষ্টি মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বহুকাল আগে থেকেই শুধু নয়, সাক্ষী আছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ তার শিল্পের স্বাক্ষর রেখে এসেছে নানারূপে নানা ভঙ্গীতে। কেবলমাত্র পোযাক-পরিচ্ছদের ক্রমবিবর্তন বা অস্ত্রশস্ত্রের নব-নব পরিকল্পনার মধ্যেই সে শিল্পসত্তা আবদ্ধ হয়ে থাকেনি, পরিব্যাপ্ত হয়েছে তা সেদিন-কার বর্বর মানুষের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির রাজ্যেও। তার নিদর্শন আছে পৃথিবীর নানা দেশের গুহাগহ্বরে, মিশরের পিরামিডে, মহেঞ্জোদারো হরপ্পার কষ্টিপাথরে। এ রূপচর্চা আদিযুগেরও প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো একটি-কি-দুটি মানুষকে শিল্পচেতনার অসহ্য যন্ত্রণায় অহর্নিশি পীড়ন করে মেরেছিলো, কিন্তু আমাদের ভাগ্য, তা সেদিনকার সেই দুঃখের অন্ধকারের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়নি। কিংবা সে পরিণতির নির্মমতায় তাকে ভেসে যেতে দেয়নি রূপের সাধক মানুষের সুন্দর প্রাণ। শিল্পচেতনা যখন একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে জন্ম নিলো এবং যখন দেখা গেলো, সে-চেতনা ধীরে ধীরে, তা যতই নিঃশব্দ পদক্ষেপেই হোক না, বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটা রূপের পিপাসা হয়ে সঞ্চারিত হয়ে গেলো, তখন বুঝতে হবে, সে-চেতনা বহু মানবের মনের মধ্যে একটা মধুর ইচ্ছে হয়ে এমনিতেই সুপ্ত হয়ে ছিলো। তার আবরণটি উন্মোচিত হতে তাকে চিনতে কারো তাই ক্ষণমাত্রও ভুল হলো না।

এই যে বেদনা তা রহস্যজনক ভবিতব্যের মতো এক অনাস্বাদিত আনন্দের উৎস ছাড়া আর কিছু নয়। সৃষ্টির মূল কথাই তাই।

একটিমাত্র আধার এ আনন্দকে ধরে রাখতে পারে না, সহজ তার তাই অবাধ সঞ্চরণ, সুতরাং একের সৃষ্টি অন্যেরও উপভোগের বিষয়। তা হলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, সৃষ্টির বেদনা যে পরম সহিষ্ণুতায় সহ্য করেছে পলে পলে, তার কি কোন দাবীই আর থাকবে না তারই নিজের সৃষ্টির ওপর। শিল্পীর প্রতি শিল্পের কিন্তু প্রাথমিক শর্তই এখানে। যার উপভোগ সহস্রজনের অধিকারগত, তাকে নিজের বলে ধরে রাখা সম্ভব নয় আর। এই জন্যই শুধু নয় যে আপন মনের মাধুরীর স্বাদকে সহমর্মী প্রতিবেশীর মনে বিলিয়ে দেওয়াতেই তার পরম আনন্দ। তাছাড়াও আর একটি বিশেষ কারণ এই, যশোলিপ্সাই হোক, কি অন্য যে কোন কারণই হোক, অপ্রাপ্তির অতৃপ্তিই মানুষকে বারবার সামনের দিকে ছুটে চলতে বাধ্য করে। যেখানে তৃপ্তির শেষ, সেখানে চলারও শেষ। তাই অসহ্য বেদনা সত্ত্বেও নতুন কোন বেদনার আস্বাদনকে অনুভব করতে স্রষ্টার অসীম ব্যাকুলতা। শিল্পবিষয়ের মূলে এই বেদনাকে যদি মরমী ভোক্তা অনুভব করতে না পারে, তা হলে বুঝতে হবে, সৃষ্টির মাহাত্ম্যই সেখানে অনুপস্থিত, এবং শিল্পীর কামনাটিও নিষ্কলুষ নয়। শুধুমাত্র যশোলিপ্সা, অন্তত সাহিত্য শিল্পের মতো সূক্ষ্ম কারুকর্মে, সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় তার রচয়িতাকে পৌঁছে দিতে পারে না।

শিল্পীমনের স্বার্থপর ইচ্ছেটার কথা অনায়াসেই বাদ দেওয়া চল্‌তে পারে এই কারণে যে, সৃষ্টিকর্মে মূল উদ্দেশ্যটাই যখন কলঙ্কমুক্ত নয়, তার আবেদনও অবধারিতভাবে সংকীর্ণ হতে বাধ্য। এ দিকটাকে এড়িয়ে গিয়ে যদি প্রতিটি রচনাকে তার স্বমহিমায় দেখতে চেষ্টা করি, তা'হলে তার দ্বৈতসত্তা নিশ্চিতভাবেই শিল্পভোক্তাকে চিন্তিত করবে। এ দুই সত্তা মিশে আছে তার ভালো আর মন্দে, তার সঙ্গতি আর অসঙ্গতিতে। বলা বাহুল্য, মানব সভ্যতার একটি আদি এবং অকৃত্রিম সত্যসন্ধান এই যে, পৃথিবীতে পরম সত্য বলে কিছু নেই। তার সহজ,

মানে, অবিমিশ্র একক সত্তা নিয়ে কোন কিছুর পক্ষেই বেঁচে থাকা অসম্ভব। ধর্ম কিংবা সাংস্কৃতির গূঢ় আলোচনায় যেমন এ-উক্তির যাথার্থ্য স্বীকৃত, তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের পক্ষেও তাই। তা যদি হয়, তা হলে শিল্পসৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে তার এই দ্বৈতসত্তার আবিষ্কারকেও না মেনে উপায় থাকে না। অন্তত, আবহমানকালের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এ অবশ্য-স্বীকৃত পন্থায় নিজেদের ধরা দিতে বাধ্য হয়েছেন, সমস্ত পৃথিবীর বিজয়স্তম্ভের মতো অবিনশ্বর প্রত্যেক শিল্পস্রষ্টাই। এমন হতে পারে, সহজাত জীবন-চেতনাধ্যানে অভ্যস্ত প্রতিবেশীজনের অনুভব সংকীর্ণ এবং শিল্পীর মতো তার কল্পনা তেমন সুদূরবিস্তারী নয়। সে-রকম হওয়াই বেশী স্বাভাবিক। কেন-না সফল শিল্পীমাত্রই সত্যদ্রষ্টা এবং অনাগত যতই কেন-না প্রকাশিত বর্তমানের মর্মে নিহিত থাক না তার মূলের সন্ধান নেওয়ার মতো গভীর অন্তর্দৃষ্টি সাময়িককালের খুব বেশী মানুষের দিব্যচক্ষে থাকে না। অথচ সাময়িক কাল এবং সেকালের রসভোক্তারাও পরিহাস নয়। এ অবস্থায় শিল্পীর রচনায় দ্বৈতসত্তা যেমন তৎসাময়িক কালে বিচার্য, তেমনি যে অনাগত দিনের স্বপ্ন তাঁর অনুভূতিতে ধরা দিয়েছে সেই ভবিষ্যৎ দিনের কাছেও তা সমানভাবেই বিচারের বিষয়। এইজন্যই বিশেষ করে দেখতে পাই কোন একজন লেখক বা শিল্পী বরাবার এসে দাঁড়িয়েছেন বিচারকের সামনে—শতাব্দীর ব্যবধান সত্ত্বেও। সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অবধি নেই।

রচনার মধ্যেই তার দ্বৈতসত্তা নিহিত হয়ে আছে। অবিমিশ্র আনন্দের মতো অখণ্ড পূর্ণতার ধারণাও অবস্তাব, তাই প্রতিটি শিল্পকর্মের মধ্যে যে অপূর্ণতার রেশটুকু থেকে যায়, তাই শেষ পর্যন্ত শিল্পীকে বাধ্য করে নতুনতর পথে তার শিল্পকে চালিত করতে। তাতে দুর্বিসহ যন্ত্রণা থাকলেও তাকে মানতেই হবে, কারণ স্রষ্টার প্রতি তাঁর

সৃষ্টির কোনো মায়া নেই, ক্ষমা নেই। তাকে রেহাই দেবে সে শুধু তখনই যখন আপনার ধ্যানের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আত্মতৃপ্তির অন্ধকারে নিজেকে গুটিয়ে নেবে রচনাকার—তারপর তার রচনার কোন দাম নেই, সে শুধু অভ্যাসের ফল, ইনার্শিয়া। তা যেমন সৃষ্টি নয়, রচনাকারও তেমনি সেখানে স্রষ্টা নয়। সমব্যথী রসভোক্তার কাছে সে-রচনার আবেদনও যৎসামান্য।

এই যে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দ্বন্দ্ব, এ-দ্বন্দ্বই পূর্ণতর রচনাসৃষ্টির ইঙ্গিত জোগায়। সে তার প্রেরণার উৎস। তাকে আবেগ বলতে পারি। আবেগ আর শিল্পসত্তা কিন্তু এক জিনিস নয়। একটি যদি সামনের দিকে এগিয়ে চলতে সাহায্য করে অন্যটি অন্তর্দৃষ্টি এবং বোধ দিয়ে সামনের সেই পথটাকেই একবার ভালো মত বুঝে নিতে চায়। একটি যদি গতি তো অন্যটি অগতি। সুতরাং এ দুই-এর সমন্বয় কিংবা বলা ভালো, নিঃসন্দিগ্ধ সামঞ্জস্যই শিল্পকে তার স্বরূপে উদ্‌ঘাটিত হতে সাহায্য করে। কেবলমাত্র প্রেরণাতেই সব কথা শেষ হয়ে যায় না, আবেগও রচনাসৃষ্টির পক্ষে শেষ কথা নয়। সে সঙ্গে অভিজ্ঞতালব্ধ এক সংযত শিল্পবোধকে আয়ত্ত করা প্রয়োজন প্রত্যেক শিল্পীকেই।

এহ বাহ্য। তারও আগে, এমন কি শেষ পর্যন্ত, চিনতে পারা চাই আত্মপ্রত্যয়কে। তার নাম দিতে পারি শিল্পীর বিশ্বাস। শিল্প-কর্মের সবটাই যদিও আনন্দ থেকে এবং আনন্দের জন্য, তথাপি তার কোথাও চাপল্যের ফাঁক নেই। ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না, কথাটা এতখানি সত্য যে তার সত্যতাকে প্রমাণ করবার জন্য অনেকগুলো দৃষ্টান্তের অবতারণা করার প্রয়োজনও বোধ করে না কেউ। তাই কেবলমাত্র দৃষ্টি এবং বোধের ওপর ভরসা রেখে এ পথে এগিয়ে চলার কথা ভাবলেই যথেষ্ট হবে না তা বলাই বাহুল্য। তার আগে জানতে হবে এ পথে চলার অধিকার শিল্পী সত্যি-সত্যি আয়ত্ত করতে পেরেছেন কি-না। অবশ্য এখানে এমন নিদর্শন দেওয়া অসম্ভব নয় যে,

শুধু অভ্যাসে আর চর্চায় একজন চিত্রকর যথার্থ শিল্পী হতে পেরেছেন, কিংবা একজন লেখক হতে পেরেছেন মান্য সাহিত্যিক। কিন্তু এ-যুক্তি উত্থাপনের আগে নিশ্চয়ই তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার অভিজ্ঞতাটির কথা মনে রাখতে পারি আমরা। তথাপি একটি বিশেষ, যদিও অসাধারণ নয়, প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। অভ্যাস মানুষকে কি সত্যই শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিতে পারে? আমি মনে করি, তার ক্ষমতা একজন লেখককে তাঁর সমসাময়িক কালের মধ্যে তাঁর উপযুক্ত, এমন কি, আশারও অতীত প্রতিষ্ঠায় তুলে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার পেছনে তৎসাময়িক অনেক কারণ থাকতে পারে, যার মূল্য দীর্ঘস্থায়ী নয়। গত ষাট বৎসরের সুদীর্ঘ তালিকায় এমন অনেক কবি সাহিত্যিকের নাম আছে যারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, অথচ যাঁদের স্মৃতি আজ সাহিত্য রসভোক্তাদের মন থেকে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অন্যপক্ষে কোনো পুরস্কারের দাক্ষিণ্য বা ঔদাসীন্য টলষ্টয়, জোয়ান বয়ারের মতো সাহিত্যিকদের প্রবহমান খ্যাতিকে স্পর্শ করতেও অক্ষম। একদিন যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন আজ আমরা তাঁদের ভুলে যেতে বসেছি কেবলই-মাত্র পুণর্মূল্যায়নের তাগিদে একথা মনে করলে চলবে না। মহাকালের পক্ষপাতিত্ব নেই, মূল্যায়নের বিচারে তার কাছে সকলেই সমান। সুতরাং বুঝতে হবে এই সাময়িক প্রতিষ্ঠার কারণ অন্য কোনোখানে। ব্যবহারিক অর্থে তা ভৌগোলিক, অর্থনীতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক হতে পারে, কিন্তু এটুকু সত্য যে সে-সব রচনাকারের মধ্যে জীবন ও প্রকৃতির প্রতি অটল বিশ্বাসে কিছু ফাঁক অবশ্যই ছিলো, যাকে পূরন করা লিপিকৌশল বা অভ্যাসের সাধ্য নয়।

সভ্যতার ইতিহাসে যতদিন পর্যন্ত মানুষের মনে নিলিপ্ত আনন্দ ও চিরন্তন রূপের আকর্ষণ বেঁচে থাকবে ততদিন শিল্পচর্চার প্রতি তার প্রেমকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে এমন ক্ষমতা কোনো রকম সাময়িক উত্থান-পতনের বা মূল্যবোধের নেই। যথার্থ শিল্পীমন এসব সাময়িকতাকে

উত্তীর্ণ হতে পারে সহজে, তাই তার অবস্থান কালব্যাপী। এই ব্যক্তিগত বোধ শিল্পভেদে বিভিন্ন রূপ নিলেও, চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যে তা এক এবং অভিন্ন। সে তার আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই সে বেঁচে থাকতে পারে সমস্ত প্রকার আঘাত-সংঘাত-প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে। একজন সফল শিল্পীর পক্ষে তাই এই আত্মপ্রত্যয় বা আত্মবিশ্বাসকে আবিষ্কার করার মতো বড় কীর্তি আর কিছু নেই। এ-কথা তো সত্য যে, কোন একটি বিশেষ রচনার মধ্যেই তার স্রষ্টা সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হন না, এমন কি তাঁর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ-রচনার মধ্যেও না। প্রতিটি খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত রচনা হয়তো আইনের লৌহ ছাঁচে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সামগ্রিক বিচারে তা রচনাকারের চেতনার খণ্ডিত প্রকাশ মাত্র। সমগ্র জীবনের রচনার ভেতর দিয়ে এ-আবিষ্কার চলতে থাকে পদে-পদে, পলে-পলে। শুধুই যে বিশ্বাসের ক্রমপরিণতি তা নয়, পথের মোড়ে মোড়ে আছে থম্‌কে থামা—দ্বিধাদ্বন্দ্বের সংশয় দোলা। এ সংশয় ক্ষণিকের হলেও তার মূল্য কিছু কম নয়। যন্ত্রণার দহনে জ্বলে সে ক্ষণসংশয়কে উত্তীর্ণ হতে হয় শিল্পীকে। বিশ্বাস ও সংশয়ের টানাপোড়েন চলছে তাই সমস্ত জীবনসংগ্রামে। তাকে জানতে না পারলে শিল্প ও শিল্পী দুই-ই অজানা থেকে যাবে। শিল্পী নিজেকে আবিষ্কার করে চলেছেন অথচ এ আবিষ্কারের শেষ বুঝি কোথাও নেই!

'যে-আমি স্বপন-মূরতি গোপনচারী
যে-আমি আমারে বুঝিতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।'

নিজের সম্বন্ধে এর চেয়ে সত্য কথা একজন কবির পক্ষে বোধ হয় আর কিছু নেই। মনে রাখতে হবে এ-সংশয় ব্যক্তির নয়,—কবি রবীন্দ্রনাথের মতো একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর।

দ্বিধাহীন প্রত্যয় নিয়ে ভুল পথে চলার নিদর্শনও নিশ্চয়ই কিছু আছে। নিশ্চিত পথের সন্ধান না পেয়ে কত শিল্পী সাহিত্যিক যে মাথা কুটে মরেছে তার সংবাদ আমরা রাখি না। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের ভাগ্যে মাইকেল এঞ্জেলো বেঁচে গিয়েছিলেন—বাঁচিয়ে দিয়েছিলে, তাঁকে এক অন্ধ চক্রান্তের অনমনীয় জেদ। মূর্তিশিল্পে অনিবার্য প্রতিষ্ঠাকে আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন এঞ্জেলো, কিন্তু একান্ত অনিচ্ছায় বাধ্য হলেন ছবি আঁকতে। প্রথম দিনের সেই শিল্পীপ্রাণের মর্মান্তিক বেদনার কাহিনী লিখে রাখলেন, 'আমি, ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলো, আজ গীর্জার গায়ে ছবি আঁকতে শুরু করলাম।' আত্ম-বিশ্বাসের ফাটল ঢাকা পড়লো না, বিশ্বচিত্তবিমোহন ছবিগুলো আঁকতে আঁকতে দীর্ঘ এগারো মাস পরেও বুকের ক্ষত চেপে ধরে তিনি লিখে রাখলেন; 'এ আমার বৃত্তি নয়,······বৃথাই সময় নষ্ট করছি আমি।" ভুল, ভুল, পৃথিবীর অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আত্মবিশ্বাসে ভ্রম!

কিন্তু সত্যিই ভুল কি? শিল্পতত্ত্বের গূঢ় রহস্যের দ্বার যিনি আগেই উদঘাটিত করতে পেরেছিলেন তাঁর কাছে শিল্পকলার কোনো পথই অনাত্মীয় নয়। তবু যে তাঁর খেদ, তার পক্ষে বোধহয় এ-যুক্তি দেখানো যায় যে, তিনি অভ্যাসকে বিশ্বাসের ওপরেও স্থান দিতে চেয়েছিলেন, কিংবা আনন্দময় ইচ্ছাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি ও বোধ তাঁর প্রত্যয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করতেই বাধ্য হয়েছে। চিত্রশিল্পী আর ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলোর মধ্যে শিল্পগত কোন বিরোধ ছিলো না বলেই বিস্ময়কর সামঞ্জস্য সম্ভব হয়েছিলো। এখানে টলষ্টয়ের একটি উক্তি এ সামঞ্জস্যের সঠিক রূপটিকে তুলে ধরতে পারে, 'Every man bears in himself the germs of every human quality ; but sometimes one quality manifests itself, sometimes another, and the man often becomes

unlike himself while still remaining the same man."[১]

আরো কাছে আছেন সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তিনি হাত দিয়েছিলেন ছবি আঁকায়। এমন কল্পনা করা অসম্ভব যে অধিকতর যশঃস্পৃহা কিংবা শুধুই অবসর বিনোদনের জন্য তিনি জীবনের প্রান্তসীমায় এসে হাতে তুলে নিয়েছিলেন পট আর তুলি। পৃথিবী-বিখ্যাত কবি-গীতিকার কথাসাহিত্যিক-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ অনভ্যস্ত হাতে ছবি আঁকলেন, প্রথম টানেই মূর্ত হ'লো তার বৈশিষ্ট্য। চিত্রশিল্পে সেই অনন্যতা সমালোচকদের বিচলিত করে ছড়িয়ে গেলো দিগ্বিদিকে। আসল কথা, চিত্রশিল্পী হিসাবে হঠাৎ কোনো ভিন্নতর সত্তাকে আবিষ্কার করার প্রয়োজন ছিলো না তাঁর— এ শিল্পীজনোচিত পরিণতি। অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ রূপশিল্পীর পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। তা যদি হয় তা হলে বিশ্বাস করা যেতে পারে, মাইকেল এঞ্জেলোর দ্বিধায় প্রত্যয়ের প্রতি সংশয় ছিলো না, ছিলো পরের ইচ্ছার পায়ে আপন শক্তিকে সমর্পণ করার আপত্তি; এখানে উল্লেখযোগ্য, এ অঘটন যখন ঘটে তখন শিল্পীর বয়স মাত্র তেত্রিশ। সুতরাং অনুমান করতে দোষ নেই, না হলে পরবর্তী জীবনে আর একজন মহৎ শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁকেও এই চিত্রশিল্পের পথটিকে খুঁজে বের করতেই হতো সম্পূর্ণরূপে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য।

যীশু ঈশ্বরের রাজ্যে শিশুকে বলেছিলেন মহত্তর, আরো বলেছিলেন, মানব হৃদয়কে তারই মতো সরল করতে। বলা বাহুল্য মহৎ শিল্পী শিশুরই মতো। একই রকম বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি জগৎসংসারের দিকে—অনুভবের পরতে পরতে নিত্য নতুন আবিষ্কার। সেখানে লিপ্সা নেই, আছে রহস্য উন্মোচনের ব্যথা, আরো আছে সৃষ্টি সুখের পরম আস্বাদ। জাগতিক জীবের কাছে তাই শিল্পীর কামনা অবাস্তব। কিন্তু উপায় নেই, নৈর্ব্যক্তিক উদারতা

ছাড়া মঙ্গলময় দৃষ্টিকে পাওয়া অসম্ভব—সে দৃষ্টি শুধু বর্তমানকে দেখেই তুষ্ট নয়, নির্মল স্বচ্ছতায় সে অনাগতকেও দেখতে চায়।

১। Resurrection প্রথম খণ্ড ৫৯ পরিচ্ছেদ

সাহিত্যে সমাজচেতনা ও ব্যক্তি-মানস

বেদনা থেকে সাহিত্যের জন্ম, সাহিত্য আনন্দের জন্য। নির্লিপ্ত মানুষের ব্যথাবোধ অন্তর্মুখী, তাই আনন্দও তার আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু মানবসভ্যতা এবং সমাজশৃঙ্খলার মধ্যে বাস করেও যে-মানুষ ব্যক্তিগতভাবে নির্লিপ্ত থাকতে পারে, সমাজজীবনে সে সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। ব্যষ্টিরূপে তার ব্যথাবোধ কচিৎ-কখনো যত গভীরভাবেই দেখা দিক না, তার প্রকাশ একান্তই ব্যক্তিগত না হয়ে পারে না। তাই সমাজ-মানস যেমন তার বেদনাবোধের ব্যতিক্রমকে অগ্রাহ্য করে চলে, তার আনন্দানুভূতির ব্যতিক্রমের প্রতিও তার তেমনি কোন উৎসাহ নেই। ব্যষ্টি ও সমষ্টির যুগ্ম-চেতনায় যখন সমাজজীবনের অগ্রগতি নির্ভরশীল, তখন, সমাজ-অচেতন ব্যক্তি-সাধনা যেমন একদিকে অর্থহীন, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তিমানসের ব্যবহারিক জীবনলব্ধ ঐকান্তিক অভিজ্ঞতাকে সুস্পষ্টরূপে অস্বীকার করাও সামাজিক ব্যবহারের পরিপন্থী। অথচ, আপাতভাবে সমাজকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ, অগ্রগমনই যদি লক্ষ্য হয় তবে সমন্বিত প্রয়াসের মুখে কার ক্ষীণতম প্রচেষ্টা অপসৃত হলো তার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় সমাজের নেই। বৃহৎ স্বার্থের পায়ে ক্ষুদ্র স্বার্থের বলি হওয়াটাই সামাজিক রীতি। কিন্তু এখানেও অঘটন ঘটে। প্রচলিত রীতিকে অগ্রাহ্য করে কখন-কখনও ব্যক্তিচেতনা যখন সোচ্চার হয়ে ওঠে তখন সমাজজীবনে ব্যতিক্রম ঘটে এবং তখনই দেখা যায় সেই একক সত্তার ইঙ্গিত মেনে চলেছে সমস্তটা যুগ। যদি এ রীতি-ব্যতিক্রম না ঘটতো কখনও, চিরাচরিত প্রথাকেই যদি মানুষ অবধারিত বলে গ্রহণ করে এগিয়ে চলার প্রয়াস

পেতো, তাহলে আর যাই হোক সংঘটন ঘটতো না—এবং তা'তে যে প্রবাহ থাকতো, চিরাচরিত ধারাপ্রবাহ ছাড়া তার অন্য কোন নামান্তর নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিসাধনারও প্রয়োজন আছে, যে সাধনা সমাজ-চেতনাকে স্বীকার করে। আর সমাজ-শরীরে প্রতিটি ব্যক্তি-মানসের যদি স্বাক্ষর না পড়ে তবে সে সমাজসংস্থা অসম্পূর্ণ, সুতরাং বৈশিষ্ট্যহীন।

সাহিত্যের দরবারেও তাই ব্যক্তি ও সমাজের স্থান সংলগ্ন আসনে। ব্যক্তির আনন্দ-বেদনা যদি তার প্রকাশিতরূপে জনসাধারণের আনন্দ-বেদনাকে উদ্বুদ্ধ না করে তবে তার সে-রূপ ব্যর্থ, সে-রূপচর্চার কোন মূল্য নেই। কিন্তু সে অসাধ্য সাধন হবে কেমন করে? আমার একান্ত ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনা যে হাজার-হাজার প্রতিবেশীরও সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনার প্রতিরূপ হবেই তার কি কথা আছে, আর তা যদি হয়ও তাহলে এই যে ব্যক্তিগত অনুভূতিসঞ্জাত রূপ-প্রকাশ তার আর স্বকীয়তা রইলো কোনখানে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, সে অসাধ্য সাধন হবে সাহিত্যিকের রূপপ্রকাশ ক্ষমতার সার্থকতম ইঙ্গিতে। যদি তা নাই হবে, তবে একই সমাজের অন্তর্গত সামাজিক জীব হয়ে, একই ভাষায়, একই কালে সাহিত্য-সাধনা করে কেউ-বা অক্ষয় নামের অধিকারী হন, আর কেউ-বা নিঃশেষিত বিলুপ্ত হয়ে যান স্বল্পকালমধ্যেই, তাই-বা সম্ভব হয় কেমন করে! প্রকাশক্ষমতা হয়তো আয়ত্তসাপেক্ষ, কিন্তু যে অনুভূতি অন্তরভেদী তাতো আর আরোপিত অভ্যাস বা অনুকরণের অপেক্ষা রাখে না, তা স্বতোৎসার। তাই, রূপপ্রকাশে যদি সরলতা না থাকে, তবে জটিল শিল্পকলা তার আভরণের আড়ম্বরে জটিলতর হয়ে উঠবে তা'তে আর সন্দেহ কি। সুতরাং সঙ্গত, যা সরল তা সরলরূপেই প্রকাশ পাক, তাকে যেন চাতুর্য এসে কলঙ্কিত না করে। তা যদি সম্ভব হয় তা হলে দেখা যাবে অসাধ্য

সাধন ঘটেছে, যে অনুভূতি সহজ ও সরলরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল ব্যক্তিমানসে, সহজ সরল রূপপ্রকাশেই হয়েছে তার সত্য উদ্ঘাটন। সরলতাই তার ভূষণ, অশেষ যার সৌন্দর্যসুষমা। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণের প্রত্যাশী নয়, সাধারণ বুদ্ধির কাছে তা এমনিতেই স্বপ্রকাশ। এবং প্রথম প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে তার কিছু ব্যাখ্যাও নিহিত আছে। আমার হৃদয়ানুভূতি যদি সত্যি হয়, তাতে যদি খাদ না থাকে, তবে আমার প্রতিবেশীর হৃদয়েও কেন সে অনুভূতি আন্দোলিত হবে না?

সাহিত্যস্রষ্টা তো সামাজবহির্ভূত কোন জীব নয়, তবে সমাজের প্রতিটি মানুষের সুখদুঃখ থেকে তার সুখদুঃখ অন্যতর হবে কেমন করে! ব্যক্তিগত অভাব-অনটন বা ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যসম্ভার থেকে যে-ব্যথা যে-আনন্দ কিংবা তার পরস্পরবিরোধী অনুভূতি তা একক হতে পারে না, তা হয় না। ব্যক্তিমানুষ এই সাধারণ অনুভূতিকে মহত্ত্ব যদি দিতে পারে তবে তার প্রতিবেশী হয়ে আমরা তারই মধ্যে আপনার অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ করে নতুন করে বিষণ্ণ বা আনন্দিত হয়ে উঠবো তা আর বিচিত্র কি! হয়তো জিজ্ঞাসা জাগতে পারে, কিন্তু এই অভাব, অনটন কিংবা এই ঐশ্বর্যসম্ভার—এতো মানুষের ব্যবহারিক জীবনের কতগুলি বহিঃপ্রকাশ মাত্র, তারা চোখকানের স্পর্শোপলব্ধিরই অধীন, সুতরাং তাদের রূপপ্রকাশে সত্য অপলাপের অবকাশই বা কোথায়; সাহিত্যের উপাদান হয়ে এসব ছোট-ছোট সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষের কোনো উঁচু আদর্শচেতনাকে যেমন উদ্বুদ্ধ করতে পারে না, তেমনি তারা পারে না মানবজীবনের গভীরতর ধ্যান-ধারণাকেও প্রকাশ করতে। খাঁটি কথা। তবু ব্যবহারিক জীবনে যা সামান্য যা তুচ্ছ, তারই উল্লেখ করলাম আমি এইজন্য যে, দৈনন্দিন ঔদাসীন্যে প্রতি মুহূর্তের চোখে-দেখা, অনুভব-করা সামান্য কিছুকে আমরা যতোই না কেন ভুলে থাকি, তার সত্য মূল্য বিশেষ করে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলে তাকেই আমরা নতুনভাবে যেন দেখতে শিখি, চিনতে

শিখি। তুচ্ছাতিতুচ্ছের এই বৃহত্তর আবেদনের মধ্যেই নিহিত আছে সাহিত্যিকের সত্য অনুভূতি, তাই তাঁর অভিজ্ঞতা একান্তভাবে নিজস্ব হয়েও সর্বজনীন। এবং এই একই কারণে মানবজীবনের গভীরতর ধ্যানধারণা রচনাকারের সর্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্পর্শ পেয়ে সুদূরবিসারী হয়ে উঠতে পারে। জীবনজিজ্ঞাসায় যদি আন্তরিকতা থাকে তবে তার মীমাংসা দেশ ও কালের বিভেদ ঘুচিয়ে সর্ব-মানবসমাজে গিয়ে পৌঁছবেই।

কিন্তু তা হলেও, আর একটা প্রশ্ন থেকে যায়। রচনাকারের হৃদয়ানুভূতি যদি সর্বকালীন ও সর্বজনীন হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে একাকার হয়ে মিলেমিশেই যাবে তবে আর তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রইলো কোনখানে? সমাজচেতনা ও ব্যক্তিমানসের বিরোধ বস্তুত এই একটি জায়গাতেই। সত্য বটে পরিপার্শ্বকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব তার অনিবার্য প্রভাবকে এড়িয়ে চলা। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাকে যতই কেননা ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে রাখুক, আপনার অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যরূপে প্রকাশ করতে গেলে তার সেই ব্যক্তিগত ভাবনা-ধারণা, কিম্বা আরও সোজাসুজি বলতে গেলে, তার সেই ব্যক্তিসর্বস্ব মনোবিলাসের অতীত হয়েই তাকে এগিয়ে আসতে হবে। তাতে যে তার নিজের কিছুই ক্ষতি হবে না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু তবু এ-কথা সত্য যে, এগিয়েই যদি চলতে হয়, তা হলে আত্মকেন্দ্রিকতার মোহগর্ত থেকে প্রত্যেক রচনাকারকে আগে মুক্ত হয়ে নিতে হবে। অবশ্য, এ-কথা কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, আত্মগত ভাবনা-কল্পনার যদি কোন মূল্যই না থাকে তবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তার প্রকাশ পাবে কেমন করে যখন এই বৈশিষ্ট্যের কথাটাকেই মুখ্যভাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তার জবাবে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ব্যক্তিগত ভাবনা-কল্পনা তো প্রতিটি লেখকেরই থাকতে বাধ্য, নতুবা কোন রঙে তিনি তাঁর

মানসপ্রতিমাকে সাজাবেন, কিন্তু আমি এখানে যে মনোবিলাসের কথা মপ্লতার বলছি তা বস্তুত আত্মা নামান্তরমাত্র। কোনো লেখকের লেখায় পরিপার্শ্ব যদি একেবারেই উহ্য হয়ে থাকে, অথচ যদি তিনি সাড়ম্বরে স্বকপোল-কল্পিত কোনো এক সামাজিকতার দোহাই দেন, তাহলে, সে-রচনার ভিত্তি-মূল পর্যন্ত যে মিথ্যার কারিগরী তা ধরতে যত দেরিই হোক পাঠক সাধারণের ভুল হবার কথা নয়। এ মনোবিলাসের পরিচয় সাহিত্যে যে পাওয়া যায় কখনো-কখনো এ-কথা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। আর যদি সত্যি কথায় দোষ না থাকে, তবে বলবো, সাহিত্যের দরবারে এ ধরনের সাহিত্যিকদেরই জয়ঢাকটা বাজে একটু সরবে। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো তার আওয়াজটা প্রথম দফায় এতই চমকপ্রদ যে আমরা সাধারণ পাঠককুল বাহবা না দিয়ে পারি না। চট্ করে ভুল বোঝাটা অস্বাভাবিক নয়, সাহিত্যের মতো এমন স্পর্শকাতর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তো নয়ই। তবু ফাঁকি দিয়ে শিক্ষিত সমাজকে ঠকানো খুব বেশীদিন চলে না, তাই একদিন না একদিন ঐ মিথ্যা আওয়াজটা ম্রিয়মান হয়ে পড়তে বাধ্য হয়ই।

তবু পাঠক-সাধারণের এই ভুল-বোঝাবুঝির পেছনে একটা যুক্তিবহ কারণও আছে বৈকি। সে-কারণের প্রকৃতি উদ্ধার করা যদি সম্ভব হয়, তা হলেই বোঝা যাবে সৎসাহিত্যে রচনাকারের আসল অর্থাৎ তাঁর একান্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কোথায়। মহৎ সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে প্রচলিত একটা ধারণা আছে মানুষের মনে যে, তাঁরা দূরদর্শী—ব্যবহারিক জীবনে সমাজগত হয়ে আরও হাজারজনের মতো বসবাস করেও সেই সমাজ এবং যুগকে অতিক্রম করে আরও অনেকটা দূর পর্যন্ত তাঁরা এগিয়ে দেখতে পারেন, দেখাতেও পারেন। প্রচলিত বলেই নয়, কথাটা প্রমাণিতরূপে সত্য। কিন্তু এই সত্যকে যাঁরা আবরিত করেন নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে এবং তারই সুযোগ নিয়ে দূরদর্শিতার মিথ্যা প্রমাণ দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন বহু অভ্যাসে ও চেষ্টাকৃত

চমৎকার কোনো শিল্পকৌশলে তখনই নতুনত্বের আস্বাদে সাধারণ মানুষ তাঁদের আপাত দূরদর্শনে বিমোহিত হয়ে পড়ে। আর সে-মোহ যখন ভাঙ্গে তখন দেখা যায়, সাহিত্যের যতটুকু ক্ষতি হওয়ার তা তাঁরা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন। এ ক্ষতিটি ব্যাপক, তাই অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সাহিত্যকারের দূরদৃষ্টি যতো না প্রসারিত, এ ক্ষতি তার তুলনায় ঢের বেশী দূরপ্রসারী। এ-কথাটা কে-না স্বীকার করবে যে, সাহিত্যপথের বিলাসী পথিক যাঁরা, যাঁরা আয়াসসাধ্য সিদ্ধিলাভের পরিশ্রম স্বীকারে কাতর, তাঁরা মহৎ সাহিত্যের আত্মার সন্ধান নিতে ততটা রাজী নন, যতটা সাহিত্যের বহিরঙ্গ সেই শিল্পচাতুর্যের সহজতর কৌশলটাকে আয়ত্ত করতে ইচ্ছুক। ফলে, ব্যক্তিগত প্রবঞ্চনার সূক্ষ্ম জালে এমনিভাবে তাঁরা জড়িয়ে যান যে, তাকেই সাহিত্যকর্ম ব'লে আন্তরিক স্বীকৃতি জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। হঠাৎ নতুন কিছু দিয়ে স্বল্পজ্ঞান সাধারণজনদের চমক লাগানো সহজ। আর কালে-কালে যুগন্ধর সাহিত্যিকও সংখ্যাভারী হয়ে জন্মান না, কারণ তা সম্ভব নয়। তাই অল্পায়াসসাধ্য যশের কাঙাল যাঁরা তাঁরা অচিরাৎ তথাকথিত পথিকৃৎদের আকর্ষণে বিচলিত হয়ে ওঠেন। পথিকৃৎ মানেই দূরদ্রষ্টা নয়, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সকল কিছুকে ভেঙ্গে ফেলার নামই সংস্কারসাধন নয়, এমন কি অনেক সময় তার ইঙ্গিতটুকু পর্যন্ত সংস্কার-সিদ্ধির পরিপন্থী। সুতরাং আগামী দিনে সমাজের রূপ কি-রকম হতে পারে সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা না দিয়ে যদি কেউ আপনার ইচ্ছামত কল্পনার লাগাম শ্লথ করে দেন তা হলে তাঁর সে-কল্পনাকে, যে-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যাক, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা করবেন না। বিজ্ঞানের সম্মতি চাই, ইতিহাসের ধারা রক্ষাও প্রয়োজন। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আজ সাম্যবাদের তাগিদে নরনারীর যৌথজীবনে বহু সমস্যা নতুন করে দেখা দিচ্ছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তুলাদণ্ডে তাদের যৌনজীবনকে

পর্যন্ত নতুনভাবে বিচার করার কথা দিকে-দিকে শোনা যাচ্ছে। আদিম প্রবৃত্তির তারণায়ই নিশ্চয়, যৌন-সমস্যা না হোক, যৌনসম্বন্ধের প্রতি মানুষের মনের মধ্যে অসীম কৌতূহল উপস্থিত। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে যদি কোন সুচতুর, তদুপরি, সুদক্ষ রচনাকার কালক্ষেপ না করেন, এবং নরনারীর বহুকাল-প্রচলিত প্রথার প্রতি অকস্মাৎ সদম্ভ বিক্ষোভ দেখান, তা হলে অচিরাৎ তিনি তাঁর অনুসারীর দলকে যে পেয়ে যাবেন তা'তে আর সন্দেহ কি। এমনটা যে ঘটেছে তার প্রচুর সাক্ষ্যও বর্তমান—এদেশেই কেবল নয়, অন্য দেশে-মহাদেশেও। বলা বাহুল্য, এ বিক্ষোভে সংস্কারের গন্ধও নেই। ঐতিহাসিক, এমন কি ভৌগোলিক পটভূমিকে ধূলিসাৎ করে, চকিতে কোনো সংস্কারসাধন অসম্ভব—তদুপরি আছে সমাজবিজ্ঞানের সদাজাগ্রত পাহারা।

এই নতুনত্বের মধ্যে দূরদৃষ্টির পরিচয় নেই, যা আছে তা সাধারণকে হঠাৎ নতুন কিছু শুনিয়ে স্তম্ভিত করার আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং এ-চেষ্টা শুধুই নিন্দনীয় নয়, বর্জনীয়ও। সংস্কারক যে, একদিকে যেমন তাকে 'বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন' হতে হবে, অন্যদিকে তেমনি মূল্যহীনেরে সোনা করবার পরশ পাথর তার হাতে থাকা চাই, নয়তো, প্রাচীন সঞ্চিত ধনকে উদ্ধত অবহেলা জানাবার অধিকার সে পাবে কোথা থেকে। একক কোনো রচনাকারের মধ্যে যদি সেই ব্যর্থ দূরদৃষ্টি সম্পাদনের উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায় তা হলে তাকে হয়তো সহজেই সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বাইরে সরিয়ে রাখা চলে, কিন্তু আমি আগেই বলেছি, অনুসরণ করেই যাঁরা কৃতার্থ, এই সহজলভ্য সিদ্ধির পথকে ছেড়ে দিতে তাঁরা স্বভাবতই অসম্মত। তাঁরা স্রষ্টা নন, দ্রষ্টা নন, অনুকরণেই তাঁদের সিদ্ধি। এবং দুঃখের হলেও সংবাদটা সত্য যে, সংখ্যায় তাঁরা চিরকালই দলভারী, আর তারই ফলে সমকালীন সাহিত্য কিছুদিনের জন্যে হলেও তাঁদের অনিবার্য প্রভাবে প্রভাবিত

হয়ে থাকে। অবশ্য এমন নয় যে, বিরোধিতার সামনে এসে কখনও তাঁদের দাঁড়াতে হয় না। হয়তো হয়, কিন্তু এ-কথাই বা প্রমাণ করবে কে যে, এ-বিরোধিতা যাঁরা করছেন তাঁরাই সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন। তা না হলেও ঐ বিরোধিতাটুকুই যথেষ্ট, তাতেই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠার পক্ষে হয়তো যথেষ্ট ইন্ধন থাকতে পারে। এবং তার ফলে নতুন আদর্শবাদীর দল তাঁদের আদর্শ-প্রচারে আরো বেশী তৎপর হয়ে ওঠেন। তাতে ক্ষণকালীন সাহিত্যপথ যে কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে থাকে না তা বলা বাহুল্য। ক্ষতি এইখানেই, তার স্থিতিও কোনো-কোনো সময় দেখা গেছে বহুকালব্যাপী। এই ক্ষতিসাধনের হাত থেকে সাহিত্যকে রক্ষা করবার জন্যই, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আবির্ভূত হন কোন যুগন্ধর সাহিত্যিক, যিনি কেবলই সাময়িক সাহিত্যকে রক্ষা করেন না, তদুপরি স্বকীয় ভাবনা ধারণায় রচনাসম্ভারে সমস্তটা সমাজ এবং যুগকে আচ্ছন্ন করে রাখেন, এবং তার চেয়ে বড়ো কথা, সেই সমাজ এবং যুগেরও অতীত হয়ে তিনি আরও অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে যান। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের এই দুর্নিবার শক্তিকে রোধ করা অসম্ভব বলেই কেবল ক্ষীণপ্রাণ সাহিত্যিক সম্প্রদায় নয়, সমস্ত সমাজ-সাধারণ তাঁর ইঙ্গিত মেনে চলতে বাধ্য। এই যে অগ্রসরণ, বস্তুত এ তাঁর সুদূরবিসারী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সমন্বিত ফল—যাকে সাধারণভাবে আমরা সংজ্ঞায়িত করি দূরদৃষ্টি ব'লে। কথাটা যত সহজে বলা হ'লো এই প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিকে আয়ত্ত করা বস্তুত সে তুলনায় ঢের বেশী কঠিন। এ-দৃষ্টিভঙ্গীকে যুগস্রষ্টা লেখকও একদিনেই আবিষ্কার করেন না। তার জন্য তাঁকে বহুরাত্রি জাগরণের ক্লান্তি, বহু উৎকণ্ঠিত দিনযাপনের অস্বস্তি সহ্য করে আসতে হয়। সমাজ এবং যুগ অতি সহজেই তাদের প্রচলিত ভাবনা ধারণাকে পরিত্যাগ করে তাঁর নির্ধারিত চেতনার কাছে মাথা নোওয়ায় না। যে সমাজ এবং যে-যুগের সীমানাকে তিনি অতিক্রম করে যাবেন, বহু প্রাণান্তকর আয়াসে তার প্রাণশক্তি ও ধ্যানধারণাকে তিনি জেনে নিতে

পারেন। এবং এই জ্ঞানই একদিন তাঁকে সে শক্তি জুগিয়ে দেয় যার বলে ক্রমশ তাঁর পথ উন্মুক্ত হয়। একটা সমাজের একটা যুগের হাওয়াকে তাই তিনি অবধারিতভাবে বদলে দিতে পারেন। আসল কথা, একদিকে যেমন তিনি নিজের আত্মার মুকুরে সমাজের প্রতিবিম্ব দেখতে পান, অন্যদিকে তেমনি সমাজের ভাবনা ধারণায় নিজের সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতেও পারেন। এই সামগ্রিক জ্ঞান ও চেতনা যদি না আসে তবে সমাজ ও যুগের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎকে চিনবেন তিনি কিসের জোরে। যে-ব্যক্তিত্বের শক্তিতে একজন যুগবিপ্লবী সাহিত্যিক তাঁর সমাজের অবধারিত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারেন, তা হঠাৎ-আবিষ্কারের বস্তু নয়, দুশ্চর তপশ্চর্যার পরিণতিতেই তাকে অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং এই ব্যক্তিত্বের ভিত্তি যেমন দৃঢ়মূল, তেমনি তার স্থায়িত্বও কালপ্রবাহী। এই ব্যক্তিত্বই সৎ ও মহৎ শিল্পীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

তথাপি, সময়স্রোতের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যগুলোকে মেনে না চলে উপায় নেই। প্রকৃতির ওপর বিজ্ঞান যতোই কেননা আধিপত্য বিস্তার করুক, সেই বিজ্ঞানেরই কোনো-কোনো আত্মঘাতী দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রকৃতিও তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ভুল করে না। তাতে সাংসারিক জীবনে মানুষের লাভ-ক্ষতি যা-ই হোক তার সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাপ্রবাহ কখনো-কখনো ব্যাহত হয়ই। সে-ক্ষেত্রে, প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য লক্ষণের উল্লেখ করে আজ একথা যদি কেউ বলেন যে, এই বিংশ শতাব্দী একক প্রতিভাকে আর প্রশ্রয় দিতে সম্মত নয়, প্রতিভাও এখন বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য, তা হলে তাঁকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। উক্তিটি অবধানযোগ্য। অমিত প্রতিভাকে যাঁরা দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ও সাধনায় আয়ত্তে আনতে পারেন, একাগ্রমনা না হয়ে তাদের উপায় নেই। তার জন্য সময়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রসন্নতা আর নির্বিঘ্ন দিনযাপনের সুযোগ—দু-ই একান্তভাবে প্রয়োজন। সমাজ এবং

যুগের সামগ্রিক রূপের সন্ধান যদি না তাঁর ধ্যানধারণায় প্রাঞ্জল হয়ে ধরা পড়ে তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না তাঁকে তাঁর ব্যক্তিত্বের রসায়ণে জারিত করে সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করা। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর রক্তক্ষয়ী তৎপরতার যুগে এই ব্যাপক সন্ধানসাধনার সুযোগ নেই। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষের জীবনযাপন-প্রণালী পর্যন্ত আজ বদলে গেছে। যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে তৎপর হতে শিখিয়েছে, অনর্থক কালক্ষেপণের যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিয়ে সব কিছুতেই সংক্ষিপ্তির প্রয়োজন অনুভব করছে সে। অন্যদিকে যন্ত্রসভ্যতারই দানবীয় শক্তির পায়ে মানুষকে অসহায়ের মত মাথা নত করতে হয়েছে। জাতিগত স্বার্থান্বেষণের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় কেবলমাত্র স্বাবলম্বী দেশগুলিতেই যে প্রতিযোগিতার টানাপোড়েন চলছে অহরহ, তাই-ই নয়, নবজাগ্রত আদর্শ চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানবতা-বোধের নতুন রূপে বিমুগ্ধ অনুন্নত দেশে-দেশেও উষ্ণ রক্তপ্রবাহের চঞ্চলতা অনুভূত হ'তে শুরু করেছে। তার ফলে, মাত্র পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী দুইটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হ'তে পেরেছে, আর অবরুদ্ধ শক্তির মুক্তি-সম্ভাবনাকে সার্থক করে এ সময়ের মধ্যেই বিজয়ী হয়েছে ঐতিহাসিক রুশবিপ্লব। আর এই আবর্তনের পরিণতিতে প্রতিদিন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিজীবন। প্রতিদিনের এই ব্যতিব্যস্ত জীবন নিয়ে একাগ্রসাধনায় সমগ্র দৃষ্টিকে সংহত রাখা স্বভাবতই অসম্ভব। কিন্তু তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। সময়ের স্রোতোধারায় যদি কিছু পরিবর্তন ঘটেই থাকে তবে তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। এবং যদি অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করতেই হয় যে, দেশ এবং জাতির সাংস্কৃতিক জীবন আহত হলে তার, বস্তুত, ষোল আনা গৌরবই লুপ্ত হয়ে যায়, তবে সে প্রয়োজনেই, সময়ের এই দুর্বিপাককেও সহ্য করে সমস্ত জাতিকে তার সংস্কৃতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে, মানুষ সংস্কৃতিকে কোন দৈন্যে, কোন

দুর্যোগেও ভুলতে পারে না। প্রতিটি দেশেই আজ উনবিংশ শতাব্দীর আবহাওয়ায় লালিত, বিংশ শতাব্দীর ভাস্বর সাহিত্যসূর্য অস্তমিত, অথচ কোন দেশই তার সাহিত্যকে স্থিতাবস্থায় আবদ্ধ হয়ে থাকতে দেয়নি। সত্য বটে, একক সাহিত্যরথী বর্তমান নেই, কিন্তু তাঁর সে স্থান পূর্ণ করেছে একাধিক প্রতিভার সমন্বিত সৃষ্টি। খণ্ডরূপে তারা পূর্বতন ব্যক্তিত্বের হয়তো ভগ্নাংশ মাত্র, কিন্তু সমষ্টিরূপে সেই ব্যক্তিত্বকে তাঁরা পেরিয়ে গেছেন। তাকে আনন্দের সংবাদই বলবো, কারণ ঐতিহ্যবাহী বিরাট প্রতিভার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানিয়েও বর্তমানের সত্য রূপকে সম্মান জানানোয় লজ্জা নেই। এবং তা প্রগতিরই লক্ষণ। এই সমষ্টিগত শিল্পীজনের একক সৃষ্টিকে ইতিমধ্যেই দেশে-দেশে যুগসংকেতে চিহ্নিত করা চলছে। এমন কি একই কালে একাধিক শিবিরও সন্নিবেশিত হচ্ছে। তাতে দোষ নেই। যদি দ্বন্দ্ব-বাদ স্বীকারে আপত্তি না থাকে, তবে, বলতে বাধা নেই, প্রকৃত প্রগতির বিচার সম্ভব এই দ্বৈত ধারারই আন্তরিক প্রচেষ্টায়। মহাকাব্যের যুগ যদি গেছে তো মহাকবির যুগও যাক, ক্ষতি নেই, কিন্তু এ-কথা সত্য যে, মহৎ সাহিত্যের যুগ কখনও শেষ হবে না।

শুধু দেখতে হবে, যে-গুণে গুণান্বিত হয়ে সাহিত্যসৃষ্টি শুধু সৎই নয় মহৎও হয়ে উঠতে পারে তার প্রতি যেন সাহিত্য-স্রষ্টাদের নিঃসন্দিগ্ধ শ্রদ্ধা থাকে। এ শ্রদ্ধা আসবে রচনাকারের সৌহার্দ্য থেকে, তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সততা থেকে। যে বেদনায় সাহিত্যের জন্ম, আনন্দঘন সাহিত্যের আবিষ্কার, সে-বেদনাকে সত্যি বলে চিনতে না পারলে ফাঁকি এসে এক সময় উঁকিঝুঁকি দেবেই রচনার মধ্যে। তাকে বাধা দেবার উপায় নেই রচনাকারেরও। কিন্তু এ-বেদনাবোধকে চিনবো কেমন করে? চিনবো হৃদয় দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সত্যোপলব্ধির জ্ঞান দিয়ে। বেদনাবিলাসের স্থান নেই সাহিত্যে, কিংবা শিল্পে। যা-দেখবো তাকে সম্পূর্ণরূপেই দেখবো, যাকে বুঝবো তাকে অখণ্ডরূপেই বুঝবো। এ

চেতনা যদি হৃদয়ের মধ্যে উপস্থিত না থাকে, তবে অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি-প্রকাশের কোন চেষ্টাই সার্থক হয়ে উঠবে না। সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিলাসের প্রবেশাধিকার নেই। একটা মানুষ খুন করেছে, সংবাদপত্রের প্রায় প্রতিদিনকার এ-একটা মুখরোচক খবর। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে একটি বিরাট ইতিহাস লুকিয়ে আছে তার মর্মভেদ করতে না পারলে মনুষ্যচরিত্র তো সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হবে না। নরহত্যা সাহিত্যের পক্ষে খুব মনোহর বিষয়বস্তু নয় জেনেও তারই উদাহরণ এখানে উপস্থিত করলাম আমি এইজন্যে যে, ক্ষমতা-প্রয়োগের সাফল্য এবং ব্যর্থতার জন্য সাহিত্যের পদমর্যাদা যে কতো উঁচুনিচুর ব্যবধানে গিয়ে পৌঁছতে পারে, মানুষের পক্ষে যা সবচেয়ে হীন এবং ঘৃন্য কাজ, তারই সাহিত্যরূপের তারতম্য দিয়েই তা বুঝতে অত্যন্ত সহজ। ওথেলোর হত্যাকাণ্ডটাই বড় কথা নয়, তার অন্তর্জালার মধ্যেই সাহিত্যের প্রকৃত তথ্য, মনুষ্য-চরিত্রের সত্যজ্ঞানকে উদ্‌ঘাটন করেছেন কবি। তাই, একটা নরহত্যাকে আশ্রয় করেও 'ওথেলো' পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটি চমৎকার নিদর্শন। রাজকাহিনী 'ওথেলো' আমাদের দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের নাগালের বাইরেকার প্রাক্তন কোন ঐতিহাসিক জীবনের অঙ্গীকার আছে বলে না-হয় এ-দৃষ্টান্তকেও আমরা এড়িয়ে যেতে পারি, কিন্তু সামান্য ক্রাইম-ষ্টোরি না লিখে অসাধারাণ ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিসমেণ্ট-এর রচনাকার হলেন কি করে ডস্টয়োভোস্কি? এখানে তো সেই একই বিষয়বস্তু, বরং এ-অপরাধ আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নাগালের মধ্যে বলে আরো বেশি পুতিগন্ধময়, কিন্তু তবু নিঃসংশয়ে এ উপন্যাস মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের সত্যিকার আনন্দ ও বেদনার, দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের, বন্ধন ও মুক্তির প্রাঞ্জল বিশ্লেষণের জন্যই গভীর অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী না হলে কোন লেখক এমনভাবে মানুষের হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে পারেন না এবং এইজন্যেই

রবীন্দ্রনাথের গল্পেও যখন তাঁর নায়িকার কটিদেশে হঠাৎ শানিত ছুরিকার বিদ্যুৎঝলক দেখে রোমাঞ্চ অনুভব করি, তখনই বুঝতে পারি তা বস্তুত রোমাঞ্চসিরিজ-পাঠের জন্যে আস্বাদন নয়।

আসল কথা, টি চক্ষুর উপলব্ধিগ্রাহ্য বস্তুজগতের স্বরূপ প্রকাশেই সাহিত্যিকের কর্মকৃতি স্ফূর্তি লাভ করে না, এই বস্তুজগতের অধীন হয়েও মানুষের সমাজজীবনের বহুধাবিভক্ত চৈতন্যের নব-নব আবিষ্কারের মধ্যেই তাঁর পরিপূর্ণ সার্থকতা। এ-দুর্লভ শক্তির যিনি অবিসম্বাদী অধিকারী তিনি তাঁর ব্যক্তিমানসকে আগাগোড়াই একটা সুনিয়ন্ত্রিত প্রস্তুতির পথে এগিয়ে চলেন, যাতে রচনাকার হিসেবে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত না হন।

গলসওয়ার্দি একটা প্রবন্ধে লিখেছিলেন, আজকের দিনের তথা-কথিত যুদ্ধ বস্তুত দুটি রাষ্ট্র বা দুজন মাত্র রাষ্ট্রচালকের মধ্যে সংঘটিত হয় না, হয় দু' রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের মধ্যে। একথা যে সত্য তা রচনাটির জন্মকালে হয়তো তেমন ভাবে প্রমাণিত হওয়ার সুযোগ পায়নি, কিন্তু আজ যখন তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের হাওয়া পৃথিবীর আকাশ বাতাস বিষাক্ত করে তুলবার উপক্রম করেছে, তখন তাকে মেনে নিতে আমরা আর দ্বিধাবোধ করবার উপায় দেখছি না। অথচ, আধুনিক বিজ্ঞান বিকাশের জন্মদাতা ল্যাভয়শিঅর অকালে জীবন দিয়ে পৃথিবীর কাছ থেকে ঋণমুক্ত হয়েছিলেন। এমন কথা মনে করা যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো যে, বিজ্ঞানের এমন বিশ্বধ্বংসী প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা কল্পনা করে আতঙ্কিত হয়েই তিনি মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তা হলেও আমরা মনে মনে কিছু সান্ত্বনা খুঁজে পেতাম। কিন্তু তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু আমাদের সে সান্ত্বনা দেয় না। ফলে, নির্বিকল্প অগ্রগতিতে বিজ্ঞান তার পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। এ ব্যাপার থেকে এ মীমংসায় বোধ হয় সহজেই আসা যায় যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি গোলক-ধাঁধার বীতংসবিস্তারে বিভ্রমাত্মক-তার জটিল জাল থেকে উদ্ধার পাওয়া

তো সম্ভব নয়ই, বরং আত্মসমাহিতিতে সে মানুষকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখে যার মোহনীয় আকর্ষণ থেকে উদাসীন থাকাও অসম্ভব। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীকার না করে উপায় নেই; অথচ, অসুবিধা এই, আত্মসমাহিতিতে যাঁরা দর্শন-প্রস্থানের সন্ধান পেলেন, মুক্তি ঘটল বটে তাঁদের, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয়ে যাঁরা জীবন-দর্শন খোঁজেন না বা খুঁজতে পছন্দ করেন না, তাঁরা অস্বস্তিই শুধু ভোগ করেন, সহজ মীমাংসায় এসে কিছুতেই পৌঁছুতে পারেন না। তার কারণ বুদ্ধিবৃত্তির অবধারিত বৈপরীত্য চিত্তবৃত্তিকে প্রাধান্য দিতে তাঁরা সঙ্কুচিত নন, এমনকি তার চেয়েও গভীর কথা, তাঁদের প্রায় শতাংশই এই চিত্তবৃত্তিতে বিশ্বাসী।

দর্শনশাস্ত্র বুদ্ধিবৃত্তির উপর ষোলকলায় নির্ভরশীল, কারণ সে যুক্তিবাহী। বিজ্ঞানী ধুরন্ধরদের অবদান-শতকে যুক্তিবাদের স্থান প্রথম, সুতরাং মান-নির্ণয়ে তার প্রাধান্যও সর্বাগ্রগন্য এবং বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে যে যুগের মূল্যমান বিচার্য, বলা বাহুল্য, সে যুগে যুক্তিবাদকে বাদ দিয়ে চলা বিপদজ্জনক, হয়তো অসম্ভবই। সঙ্গীতকলা আর্টের স্তরবিচারে সূক্ষ্মতম বিদ্যা, এখানে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বা যুক্তি-তর্কের মুদ্গরঘূর্ণি এসে যজ্ঞ পণ্ড করবে কখনো এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয়, কিন্তু তাও তো হয়েছে; হচ্ছে। অবশ্য এমন কথা বলতে চাই না যে তাতে সঙ্গীতকলা আজ সমূহ বিপন্ন অবস্থার সম্মুখীন, তবে অনুমান করা যেতে পারে যে একদিন এ ঘূর্ণিহাওয়া এমনি আলোড়ন সৃষ্টি করবে যে, তার তর্জনগর্জনে লজ্জা পেয়ে সঙ্গীতকলাই মুখ লুকোতে বাধ্য হবে। সেদিন যত দেরীতে আসে ততই মঙ্গল, কিন্তু এ-যুক্তিবাদ যে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রনীতি থেকে সাহিত্য চিত্রকলাতে পর্যন্ত নির্বিবাদে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে তা আর সরবে ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই।

সাহিত্যকে ছুয়ো দিয়ে লাভ নেই, চতুরঙ্গে সেই-যে বেশি স্পর্শকাতর

তাতে আর সন্দেহ কি। কালিদাস-সেক্স্‌পীয়র-গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথের জন্মদাতা যেমন সাহিত্য, তেমনি রাজায়-রাজায় যুদ্ধ বাধানোর নারদ-প্রতিভায় সে-ই সর্বাপেক্ষা পারঙ্গম। বিশুদ্ধ এবং ফলিত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ববিচার যদিও তর্কসাপেক্ষ তথাপি এ-কথা স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই যে সাময়িক বা চিরন্তন মানুষের মনকে আলোড়িত করে তোলার ক্ষমতা তার অসীম। তাই, এ-দ্বৈতসত্তায় বিশ্বাস রেখে সাহিত্যমণ্ডলের সমগ্রতাকে অনুধাবন করাই বিধেয়। কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে এ দুই সত্তার যে বিরোধ ধরা পড়ে তাতে বরং এরকমই মনে হওয়া স্বাভাবিক, যদি বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবেদন দেশকাল-নিরপেক্ষ হয়, তবে আর ফলিত সাহিত্যের প্রয়োজন কি কিংবা যদি ফলিত সাহিত্যের প্রতিফলনে প্রয়োজনীয় মীমাংসা ত্বরান্বিত হয়, তবে বিশুদ্ধ সাহিত্য মৃতকল্প হলেও ক্ষতি নেই। অর্থাৎ যুক্তিতর্কের টানাপোড়েনে ব্যবধান প্রায় দুস্তর হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি আমরা মেনে নিই, মানুষের জীবনে এবং প্রকৃতির পরিবেশে দুটো স্পষ্ট দিক আছে যাদের মধ্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনরকমেই মিল নেই, বরং উল্টো করে বলা যায়, তাদের মধ্যে পার্থক্যটা এত বেশী গভীর যে সেখানে মিল খুঁজতে যাওয়াই বৃথা, এবং এই স্পষ্ট বিরোধী দিককেই সাহিত্য রূপায়িত করছে বিশুদ্ধ এবং ফলিত মূল্যে, তা-হলে বরং তাদের প্রয়োজনকে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব। মানুষের জীবনের এ দুটো দিক হলো, হৃদয়বৃত্তি আর বুদ্ধিবৃত্তি, অন্যপক্ষে প্রকৃতির পরিবেশে তারা হচ্ছে রূপ আর প্রয়োজন। মানুষ হৃদয় দিয়ে প্রকৃতির রূপকে যেমন আস্বাদন করে, ঠিক তেমনি সেখান থেকে তার প্রয়োজনকে বেছে নেয় বুদ্ধির পরামর্শে। নায়েগ্রা দেখে আমি যতই কেন-না উচ্ছ্বসিত হই, হাইড্রোলেকৃট্রিক এঞ্জিনিয়ররা তাকে কাজে লাগাতে কিছুমাত্র দ্বিধান্বিত হবেন না। অথচ কেমন করে বলবো আমার আনন্দটাই সত্য, তাঁদের প্রয়োজনটা কিছুই নয়; কিংবা এমন কথা বানানোও সম্ভব নয় যে

ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের দান যখন প্রত্যক্ষভাবে সত্য তখন আমার কবিতার মূল্য কিছু নেই। আসল কথা, বুদ্ধি দিয়ে পরিপার্শ্বকে বিচার করার পরও হৃদয়ের অনুভূতি প্রসারিত হতে পারে, বুদ্ধি যেমন পারে হৃদয়ের অনুসারী হতে। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থাকে, প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের ওপরই যখন মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তখন তার হৃদয়ের আবেদনই কেন সাহিত্যের দরবারে জায়গা জুরবে বেশী ; এমন কেন হবে না, প্রয়োজন মিটিয়ে অনুভূতির আবেদন যদি নিজেকে জাহির করবার সুযোগ আর অবকাশ পায় তখন কেন-না সে তার প্রবেশের অধিকার দাবী করে নিক। এ-প্রশ্নটা কিন্তু আদিম কালেই মানুষের মনে জাগতে পারতো, কিন্তু কখনও জাগেনি। জাগে নি যে তার প্রমাণই হলো প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্যপ্রবাহ গতি নিয়েছে একটিমাত্র ধারায়—কাব্যে। দীর্ঘ পথপরিক্রমণের শেষে কাব্যস্রোতা যখন উচ্ছল, তখনই এ-জিজ্ঞাসা উঠলো উন্মুখ হয়ে ; কিন্তু দেখা গেলো তার অনেক আগেই জন্ম নিয়েছে গদ্য—এবং সেও অনেকটা এগিয়ে এসে আধুনিক যুক্তিবাদকে নির্বিকারে গ্রহণ করে ফেলেছে। সুতরাং যে-প্রশ্ন আজ জাগলো, তার উত্তর খুঁজতে হবে আজকের সাহিত্য এবং প্রয়োজনের নিরীখেই। এবং সেখানে দেখা গেলো, ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ আজ যত বেশি প্রয়োজনের বশীভূত হৃদয়ের দাসত্ব করবার দায়িত্ব তার তত বেশি নয়। তার মানে, বাহির বিশ্ব আজ যতখানি আধিপত্য বিস্তার করেছে মানুষের মনের ওপর, মানুষের মনও ঠিক ততখানি আধিপত্য খুইয়েছে বিশ্ব-প্রকৃতির ওপর থেকে। তার ফলে, এ-জিজ্ঞাসা জাগা স্বাভাবিক যে হৃদয়ের আবেদনের চেয়ে বাইরের অধিকারকে কেন আগে স্বীকার করে নেওয়া হবে না। খণ্ডরূপে আংশিক দায়িত্ব স্বীকার্য হলেও তাই শেষ কথা নয়। সমগ্র দৃষ্টি যদি সম্পূর্ণ মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করতে না পারে তবে সে স্বীকৃতিতে ত্রুটি থাকতে বাধ্য। সুতরাং বিশুদ্ধ বা ফলিত সাহিত্য বিভিন্ন চেহারায়

রসাস্বাদনের খোরাক জোটালেও তাতে সাহিত্যের যথার্থ মান বিচার করা সম্ভব হয় না। তার জন্য চাই সংস্কৃত মনের উদারতা যা কেবল নিরপেক্ষ বিচারবোধকেই প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষপাতী। বুদ্ধি আর চিন্তার সাহায্যে উদ্দেশ্যকে হয়তো সফল করে তোলা যায়, কিন্তু অনুভূতিকে জাগাতে হলে আরও বেশী কিছু চাই, কিংবা এমনও বলা চলে, মানুষের অনুভূতির অনেকখানিই যুক্তি-বুদ্ধির পরিধি বহির্ভূত। তাতে অবশ্য এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে হৃদয়বৃত্তি যেহেতু যুক্তিবাদের ধার ধরে না, সেহেতু সাহিত্যের চিরন্তন মূল্যে যুক্তিবাদের স্থান শূন্য। এ উক্তি হাস্যকর, অন্তত আজকের দিনে তো বটে। অন্যপক্ষে, সহজলভ্য সিদ্ধির একমাত্র এবং প্রকৃষ্ট উপায় যখন উদ্ভাবিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে ফলিত সাহিত্য এবং যখন কর্মতৎপতার যুগে বুদ্ধি আর যুক্তির মূল্যই সর্বাধিক তখন চিরন্তন সাহিত্যের দাবীকে অগ্রাহ্য করাও বোকামি। কারণ, দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত প্রয়োজন মিটলেও, এমন কি না মিটলেও, মানুষ আজ এখন দু একটা মুহূর্তকে অতর্কিতেই ভালবেসে ফেলে যার সঙ্গে তার জীবনযাত্রার বিন্দুমাত্রও মিল নেই, অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণেও সে এ-ভালবাসার কার্যকারণ খুঁজে পায় না। অথচ, ব্যক্তিগত দীক্ষা অনুযায়ী কোনো এক বিশেষ দিকে মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক থাকলেও একান্তভাবে পৃথক দুটি সত্তার অধিকারী সে নয়। বুদ্ধি এবং অনুভূতি—এ দু'এর অলক্ষিত মিলনেই ঘটে তার রসাস্বাদন ক্ষমতা, অন্তত সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে এ-কথা সত্য বলে মেনে নেওয়ার মতো প্রামাণ্য উদাহরণের অন্ত নেই। সুতরাং বিশুদ্ধ এবং ফলিত সাহিত্যকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে না করে, বরং তাদের পরিপূরক বলে মেনে নেওয়া সঙ্গত।

কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থাকে, পরিপূরক বলে কি তারা সমন্বিত হয়ে অখণ্ডরূপে গড়ে উঠতে পারে না? যদি সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতেই

সাহিত্যের সত্যিকার মূল্য নির্ধারিত হবে, তা হলে এই সমন্বয়প্রয়াস ছাড়া অন্য কোনো উপায় তো থাকবার কথা নয়। এ-প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নির্ভর করে সমন্বয়ের সার্থকতাব ওপর। অনুভূতি মানুষের সহজাত কিন্তু বুদ্ধি বা চিন্তা তার অভিজ্ঞতার ফল। প্রথম পর্যায়ে আবেগই সর্বস্ব ছিলো বলে সাহিত্য রূপ নিয়েছিলো উচ্ছল কাব্যে, কিন্তু যখন বুদ্ধির আশ্রয় ছাড়া বাঁচবার আর কোনো উপায় রইলো না, তখনই তো দেখা দিলো যুক্তিবাদী গদ্যসাহিত্য। কিন্তু তবুও যখন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগকে অস্বীকার করবার উপায় নেই, তখন তাকেই বুদ্ধির আলোতে উদ্ভাসিত করে নিতে হবে। এটা নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার অবধারিত পরিণতি। অবশ্য, একটা কথা আছে, যা আমার নিত্যসহচর তাকে যদি প্রয়োজনের তাগিদেই গ্রহণ করতে হলো, তবে তা আমার হৃদয়ের অনুভূতিকে কেমন করে স্পর্শ করবে—এ প্রশ্ন কারো কারো মনে জাগতে পারে। কিন্তু তাঁর উত্তর মিলবে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রুচিবোধের নিকষে। নতুন করে যা কিছু আমি দেখি বা স্পর্শ করি তার সব কিছুই যে আমার রুচিবোধকে তৃপ্তি দেবে এমন কোন কথা নেই; কিন্তু অভ্যাসের দাসত্ব যখন চিরদিনের মতো মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে, তখন এই নিত্যকার পরিবেশের অনেক কিছু আমাদের সচেতন মনের অগোচরে ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে হয়—যা অবশেষে অনিবার্যভাবেই রুচিবোধের নিভৃতিতে গিয়ে নিশ্চিত স্থান পায় এবং তারই ফলে বুদ্ধি হয়ে ওঠে অনুভূতি আর যুক্তিবাদের অনলস খবরদারি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করে।

মানবধর্মী সাহিত্য এই সমন্বয়ের পথকেই আজ খুঁজে নিয়েছে। বুদ্ধি এবং বৈদগ্ধ্যের ঊষর যাত্রাতেই তার তৃপ্তি নয়, তাই সে অনুভূতির রসসিঞ্চনেও সুস্নিগ্ধ। কেবলই মাত্র ভাবকবিত্ব বা যুক্তিবাদ মানুষকে যখন পরিতৃপ্ত করতে পারে না তখন সাহিত্যের পথে এই মননধর্মের কাছে তার নতি স্বীকার না করে উপায় নেই।

অথচ এই সচেতনতা কখনও সমাজ সম্পর্কে লেখকের হার্দ্য অনুভবকে ব্যাহত করে না। এইজন্যেই একদিকে হৃদয় দিয়ে যেমন তিনি বস্তু জগতের সম্পর্ক জেনে নিয়ে তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎকে আবিষ্কার করতে পারেন, অন্যদিকে তেমনি, বস্তুগত সমাজ ও যুগও তাদের ব্যবহারিক স্বাভাবিকতার উন্মোচনে তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রকাশকে সাহায্য করে। ফলে, তাঁর দর্শন ও প্রকাশে কোন দিক দিয়েই ফাঁকি এসে তাঁকে প্রবঞ্চিত করতে পারে না। তাই তাঁর অনুভূতি সত্য, তার বেদনাবোধ আন্তরিক—আনন্দের। সাহিত্য সৃষ্টিতে তাই তিনি সিদ্ধিদাতা।

উপন্যাসে ইতিহাসের আশ্রয়

উপন্যাসের জোয়ার এসেছে বাংলা সাহিত্যে। অথচ, একদা এমন একটা আশঙ্কা অনেকেই প্রকাশ করেছিলেন, যেহেতু সাধারণ বাঙালীর জীবন সমতলভূমির নদীর মতো, সেহেতু তাকে নিয়ে লিরিক সুরের গল্প লেখা চলে, উপন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের বহুপঠিত উপন্যাস সামনে থাকা সত্ত্বেও। ইতিমধ্যে সাহিত্য সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে অন্তত একটা কথা স্থিরভাবে মেনে নিতে কারো আপত্তি হয়নি যে, জীবনপ্রবাহের কোনো একটি বিশেষ আন্দোলনের মধ্যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্যতা থাকবেই এমন কোনো কথা নেই, আসলে সাহিত্যের কারবার বিশুদ্ধ জীবনটাকেই নিয়ে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনটা না, তার চলা-বলার ঢংটাই সে মানুষটি নয়। যে আন্তর-চেতনা তাকে ঐ অভ্যাসে তৈরী করে, সেই চেতনাময় কিংবা অবচেতনের সেই মানুষটিই সাহিত্যের উপজীব্য। সুতরাং একটি উপন্যাস রচনা করতে হলে, কয়েকটি নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ করতেই হবে এমন কোনো বাধ্য বাধকতা থাকতে পারে না। আসল কথা, যে অনুভব করতে জানে তার কাছে জীবনটাই নাটক, আর যে জানে না, তার কাছে সমস্ত জীবনেও একটি ছোটগল্প নেই। অবশ্য এমন কথা বলাও সঙ্গত হবে না, বাঙালীর ঘরোয়া কিংবা সামাজিক জীবনে ইতিমধ্যে কিছু বিপর্যয় ঘটে নি। ঘটেছে যে তা প্রত্যক্ষভাবে

অনুভব করছেন সকলেই। অন্তত শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক কালে সমাজ যে চেহারায় বর্তমান ছিলো আজ তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সেদিন শরৎচন্দ্র ছিলেন অন্যতম বাস্তবধর্মী লেখক, অথচ আজকের সমালোচক তাঁকে রোমান্টিক ভাবতে হয়তো দ্বিধাবোধ করছেন না। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে, এই লোকচক্ষুগোচর পরিবর্তন না ঘটলে বাংলা সাহিত্যে এমন বিপুলসংখ্যক উপন্যাস রচনা করা সম্ভব হতো না। বড় জোর বলতে পারি, সামাজিক জীবনের এ বিপর্যয় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করেছে।

বস্তুত মানুষের জীবনটাই সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু। এবং এইজন্যেই হরিপদ কেরানী থেকে আকবর বাদসা কারো পক্ষেই কাহিনীর নায়ক হওয়ায় বাধা নেই। কেরানীর সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে বাদসাহী অনুভবের কোনো ভেদাভেদ নেই। ভেদাভেদ যেটুকু তা ব্যবহারিক প্রকাশভঙ্গিতে। এই সুখদুঃখ আনন্দবেদনায় ঘেরা যে মানুষ সে চিরকালের এবং চিরকালের সেই মানবহৃদয়টিকে উদ্‌ঘাটিত করার চাবিকাটি যার করায়ত্ত তার পক্ষে সার্থক রচনাসৃষ্টি করা খুব বেশী আয়াসসাধ্য নয়। শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ-ভোলানো যায় বটে, কিন্তু তাতে আসলটাই চাপা পড়ে। তাই দেখি, যখনই সাহিত্যপাঠে একটা করুণ অতৃপ্তি পাঠককে ক্ষুব্ধ করে তখনই লক্ষ্য করি, সে-রচনা তার অন্তরকে স্পর্শ করেনি। তার মানে, লেখক আসল মানুষটির অন্তরের কথা বলতে পারেন নি। তিনি হয়তো সুন্দর করে একটি জীবনের কয়েকটি ঘটনাকে সাজিয়ে রেখেছেন মাত্র। সাহিত্য সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়। বোধ হয় জীবনের যথার্থ প্রতিফলনটাও ঠিক সাহিত্য নয়। পৃথিবীর সব কিছুই কিছু সুন্দর, কিছু অসুন্দর, কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা। যা অসুন্দর, বলার ভঙ্গি দিয়ে তাকে সুন্দর প্রতিপন্ন করার মধ্যে বাহাদুরী থাকতে পারে, কিন্তু সত্য নেই। তেমনি যা মিথ্যা তাকে যদি স্পষ্ট করে মিথ্যাই বলতে

পারি তবে তাতে সত্যই উদ্ঘাটিত হবে। তবু সত্যকে চিনবো কি করে যদি তার যথার্থ প্রতিফলনটাও সাহিত্য না হয়।

জীবন-জিজ্ঞাসায় নিকটতম আবিষ্কারকেই আমরা পেতে চাই সাহিত্যে। অন্তত উপন্যাস আর ছোটগল্পে তো বটেই। ছোটগল্প খণ্ডকাব্যের মতো জীবনের খণ্ড অংশভাগ মাত্র। উপন্যাসের ব্যাপ্তি সমাজ ও জীবনের একটি সম্ভাব্য পূর্ণতাকে প্রকাশ করার সুযোগ পায় বলে তার আবেদনও তুলনায় ব্যাপকতর। কোনোখানেই আমরা সঙ্ঘটিত সত্যকে চাই না, চাই ঘটনার অতীত কোনো বৃহত্তর কিংবা সম্ভব হলে মহত্তর সত্যকে। কথাসাহিত্য কদাপি সত্য কাহিনী নয়, তথাপি সার্থক উপন্যাসে বা ছোট গল্পে আমরা যাদের দেখা পাই, তাদের মোটামুটি পরিচিত জন বলে ভাবতে বাধে না। এখন কথা কখনও-কখনও শুনতে পাওয়া যায়, অমুক লেখক এ-উপন্যাসটি লিখেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অর্থাৎ কাহিনীর পাত্রপাত্রী আর স্থানকাল সবটাই সত্য। কিন্তু তা কখনই সত্য হতে পারে না, কেন-না, লেখক ইতিহাস লিখতে বসেন নি, বসেছেন সাহিত্য সৃষ্টি করতে। তথাকথিত ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের এইখানেই প্রভেদ। ইতিহাস ঘটনা, সাহিত্য কল্পনা। এমন কি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসও তাই। সেখানে যদি কোনো ঐসিহাসিক ঘোষণা করেন যে, উপন্যাসের কাহিনীতে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে, তা হলে তাঁর ইতিহাস-জ্ঞানকে শ্রদ্ধা জানিয়েও সে-উপন্যাসকে গ্রহণ করতে বাধা থাকে না, যদি তা সত্যই স্থানকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসযোগ্য জীবনের কথা বলে। বস্তুত এই বিশ্বাসযোগ্য জীবনের কথাটাই আমরা খুঁজে বেড়াই গল্পে-উপন্যাসে। এবং পেলে তাকেই আমরা সত্য বলে স্বীকার করে নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করি না। তা যদি না হতো তা হলে উপন্যাস-সাহিত্যের জন্ম এবং অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হতো।

বাংলাদেশেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উপন্যাস-রচনায় যে-কটি দেশ শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে তার প্রায় সর্বত্রই প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস রচিত হয়েছে রাজকাহিনী দিয়ে। এমনকি উপন্যাস হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে যার স্থান আজও পর্যন্ত অবিসংবাদিত সেই ওঅর অ্যাণ্ড পীসের কাহিনীও ইতিহাসভিত্তিক। বাইরের খবর ছেড়ে দিয়ে ঘরের দৃষ্টান্তেই আসা যাক। সকলেই জানেন, বাংলাদেশে নতুন করে, একেবারে নবচেতনায় সাহিত্যজিজ্ঞাসা জাগে উনবিংশ শতাব্দীতে, ইংরাজী সংস্কৃতির স্পর্শ পেয়ে, সুতরাং সে-সাহিত্যপাঠের প্রেরণায়ও। তার ফলে কাব্যক্ষেত্রে নতুন সুর শোনা গেলেও তখনকার মতো সবচেয়ে বড় এবং বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস লিখে। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই ইতিহাসকে আশ্রয় করে। এমন নয় যে ইতিপূর্বে ইংরেজী সাহিত্যে মহৎ সামাজিক উপন্যাস রচিত হয়নি। তবু তিনি তাঁর প্রকাশের উপযুক্ত স্থান খুঁজেছিলেন ইতিহাসের মধ্যেই এবং রাজকাহিনীতে। পরবর্তীকালে আরও একটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, হাতের কাছে সুখপাঠ্য এবং রচনা হিসেবে সার্থক দুটি গার্হস্থ্য উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আর 'বিষবৃক্ষ' থাকতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখলেন ইতিহাসকে ভিত্তি করেই —প্রথম এবং দ্বিতীয়ও। পৃথিবীর অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে দুজন পথিকৃৎ সাহিত্যিক একইভাবে উপন্যাস-রচনা আরম্ভ করলেন কেন, সে-কথা ভাবতে গেলে আশ্চর্য হতে হয় বটে, কিন্তু এ-সমস্যার সমাধানে পৌঁছনো কঠিন কিছু নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালের বাংলাদেশ এবং বাঙালীর সমাজ ও জীবনযাত্রা সত্যিই মোটামুটি সমতলভূমিতেই প্রবাহিত হয়ে চলছিল। কেবলমাত্র জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের গণ্ডীতে আবদ্ধ একান্তই ঘরোয়া জীবনযাত্রার মধ্যে যেটুকু সুখদুঃখ-আনন্দবেদনা জড়িয়ে থাকে, তাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লেখা চললেও,

প্রথম পর্যায়ে একটু উঁচু সুরের প্রয়োজন ছিলো। এইজন্যে যে কিছু শিক্ষাহীন এবং কিছু বিদেশী ভাষার প্রতি আকৃষ্ট জনসাধারণের বাংলাভাষার প্রতি মনোযোগ টানতে হলে সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষাকে যত সহজই করা হোক, কাহিনীতে অন্তত জলুস আনা চাই, না হলে প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার গল্প মনকে আটকে রাখবে কেন? রাজরাজড়ার কাহিনীতে ঘটনার ঘনঘটা দিয়েও তাই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মূল চরিত্রটির অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন এবং আমাদের সৌভাগ্য পেরেওছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবিখ্যাতিব চূড়ান্তে পৌঁছে উপন্যাসরচনায় হাত দেননি, দিয়েছিলেন প্রায় প্রথম যৌবনেই। এবং এ-ঘটনা বাঙালী পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করেছেন যে, যদিও তিনি একেবারেই বালক-বয়স থেকেই সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন, তথাপি তিনি কখনই পাঠকের চোখে হঠাৎ-আলোর-ঝলকানি ছড়াননি। দীর্ঘ জীবন অসাধারণ পরিশ্রমের বিনিময়েই তিনি তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেছেন আমাদের কাছে। এই পথপরিক্রমায় তাঁকে বাংলাভাষার নানাদিকে হাত দিতে হয়েছে এবং পদে পদে যে বাধার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছে সে-বাধাকে তিনি প্রতিবারই অতিক্রম করে গেছেন অনায়াসে। তার ফলে ভাষার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সাহিত্যের প্রতিটি দিকেই নব-নব আবিষ্কারের পথ বেয়ে তাঁকে চলতে হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য কোনোখানেই তাঁর সেই আবিষ্কার নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেনি। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত ঐতিহ্যবাহী, একটা নতুন কিছু করতেই হবে এমন কোনো উদগ্র কামনা নিয়ে কোনোকালেই তিনি সাহিত্যরচনা করতে বসেননি। তাঁর রচনায় বারবার যে নতুনত্বের আস্বাদ বাঙালী পাঠক পেয়েছে, তা পুরাতনকে অস্বীকার করে গড়ে ওঠেনি, উঠেছে পুরাতনকে ভিত্তি করেই—সামনে চলার অনিবার্য প্রয়োজনে। তিনি জানতেন, ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু কেবল তাকে আশ্রয় করে আবর্তন

সৃষ্টি করাও চলবে না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই কথাটি মেনে নিলে বুঝতে অসুবিধা হবে না, কেন তিনি প্রথমটায় ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন, আর কেনই-বা অবিলম্বে সে-ধারা থেকে সরেও এলেন।

এ-প্রশ্ন ওঠা কি সম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের ঘটনাকে তাঁদের উপন্যাসে মেনে নিয়েছেন কি না? বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোতে ইতিহাসের কাহিনীকে যথাযথভাবে স্বীকার করা হয়নি, এবং রাজর্ষির গোবিন্দমাণিক্যও রাজমালায় এমন কিছু উল্লেখযোগ্য হয়। তথাপি যে বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে এই উপন্যাসগুলো এমনভাবে সমাদৃত হয়েছে তা শুধু কয়েকটি বর্ণাঢ্য ঘটনা সমাবেশের জন্যই নয়। সত্য ঘটনা উপন্যাসের মধ্যে যোলো আনা জায়গা না পেলেও উপন্যাসের সত্যই এতকাল ধরে আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছে। ইতিহাস তো পটভূমি মাত্র। কিন্তু যে মানুষগুলোকে নিয়ে উপন্যাসকারের চিন্তা, আমরা দেখেছি, সে মানুষগুলো ঐ পট-ভূমিতে মিথ্যা হয়ে যায়নি। একেই বলি সাহিত্যের সম্ভাব্য সত্য। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উপন্যাসের বিস্তৃতি সর্বব্যাপী। সুতরাং সর্বকালকেই সে নির্বিঘ্নে স্থান দিতে পারে। কিন্তু একটা শর্ত এই যে স্থান কাল এবং পাত্রের মধ্যে চরিত্রগত ঐক্যকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। সেই ঐক্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে। ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি দিয়ে তাঁরা মানুষকে চেনেন নি, চিনেছিলেন স্থান কালের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ব্যক্তিগত সামাজিক পটভূমিতে, যার জন্য তাঁদের উপন্যাসের প্রতিটি মানুষই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং বিশেষ কালে বিশেষ নামে বিশেষ একটি মানুষ ছিলো কি-না তার জবাবের ওপরই সব সত্য নির্ভর করে না। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন ঠিক ঐ মানুষটির ঐ সময়ে থাকা সম্ভব ছিলো

কিনা। এই সম্ভাব্যতাকে যদি কোনো উপন্যাসে লক্ষ্য করি, তবে তাকেই আমরা সত্য বলে স্বীকার করে নেবো, লেখকের স্বাধীন কল্পনা সত্ত্বেও।

এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিলে পরবর্তী মীমাংসায় পৌঁছানো কঠিন নয়। উপন্যাস এক অর্থে ইতিহাসও বৈকি। তথাকথিত ইতিহাস তো বাদশাহী দরবারের কথা, রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত আর জয়পরাজয়ের নিষ্কলঙ্ক ইতিবৃত্ত মাত্র। বাইরের জীবনের এই অঘটন-ঘটনগুলোকে বাদ দিলে যেটুকু থাকে তাতে কোনো বীরপুরুষকেই তার স্ব-মহিমায় চেনা যায় না। ইতিহাস তাই মানুষের কথা বলে না, বলে তার কাজের কথা। রাজার রাজায় যুদ্ধ বাধে, আর উলুখাগড়ারা শুধু প্রাণই দেয়, অকরুণ ইতিহাস তাদের কথা মনেও রাখে না। অথচ তারাই বাঁচিয়ে রাখে নিরবধি কালকে, তারাই সমাজ গড়ে, জনমত গড়ে, সামাজিক অনুশাসন তৈরী করে—সে অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য হয় ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মানুষ। উপন্যাস এই উলুখাগড়াদেরই জীবনকথা, সুতরাং একটা বিশেষ দেশের ইতিহাসও। সাহিত্য মুখ্যত মানুষেব কথাই বলে বটে, কিন্তু যুগেযুগে, কালে-কালে মানুষও তার স্বরূপ বদলায়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজেরও বিবর্তন অবধারিত। যদিও চিরন্তন সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনায় বয়ে চলেছে মানুষ আবহমানকাল, যদিও পিতামাতার স্নেহ, দম্পতির প্রেম, ভ্রাতা-ভগ্নী, বন্ধুজনের ভালোবাসা, সন্তান-বাৎসল্য, শত্রুর বিদ্বেষ—এ সবই চিরকালের মানবপ্রকৃতির প্রকাশ, তথাপি সামাজিক বিবর্তনের ফলে অপ্রত্যক্ষভাবে তাদেরও চেহারা বদলায়। সেই পুরাতন মনুর শাসন বহুকাল মানুষের পরিবারকে একটি বিশেষ রীতিতে গড়ে উঠতে বাধ্য করেছে, সে বাঁধন আজ যদি শিথিল হয়, মানুষের পরিবারও তবে সে শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে ভিন্ন পথে চলবার চেষ্টা করছে। শাসিত মানুষ আর মুক্ত মানুষের সামগ্রিক চেহারা অন্তরে-বাহিরে একেবারেই

আলাদা। অথচ সহজাত হৃদয়বৃত্তি থেকে তারা কেউ-ই বঞ্চিত নয়। সুতরাং দুই কাল যদি উপন্যাসের কাহিনীতে স্থান পায়, তা হলে একই মানুষ হয়েও তাদের চেহারা আঁকা হবে একেবারে ভিন্ন ভিন্নরূপে।

স্বাধীন দেশের মানুষও ব্যক্তিগত জীবনে পরিপূর্ণ স্বাধীন নয়, একটা অলক্ষিত সামাজিক শৃঙ্খলে সে বাঁধা আছেই। এই সামাজিক শাসন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা বা পরাধীনতার বড় একটা ধার ধারে না। কিম্বা সমাজের ওপর সমসাময়িক রাষ্ট্রের কিছু পরোক্ষ প্রভাব থাকলেও সামাজিক মানুষ প্রত্যক্ষ সমাজকে স্বীকার করে তার অনুশাসনকে মেনে চলতেই বাধ্য হয়। সাময়িক কালের সাহিত্য তাই সমাজ-বহির্ভূত কিছু হতে পারে না—প্রতিভাবান লেখকের বিস্ময়কর দূরদৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও। বঙ্কিমচন্দ্রের দূরদৃষ্টি ছিলো, নিজের সমাজের সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে তিনি অবহিতও ছিলেন, তথাপি রোহিণী এবং কুন্দনন্দিনীর মর্মান্তিক পরিণতির জন্য তাঁকে দায়ী হতেই হলো। তাঁর সামাজিক উপন্যাস দুটিতে কিছু অতি-নাটকীয়তা আছে, সন্দেহ নেই, নিস্তরঙ্গ সমাজ-জীবনে ভেসে-চলা মানুষের মনে চমক দেওয়ার প্রয়োজনে এ-নাটকীয়তার অবতারণা করা হয়েছিলো কিনা, সে-প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, রোহিণীর এ-করুণ মৃত্যু অবধারিত বলেই ঘটেছে—সামাজিক নির্দেশেই তাকে মরতে হয়েছে। অথচ আশ্চর্য, ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্থাপনা করেছেন বালবিধবার শাস্ত্রসম্মত উপায়ে পুনর্বিবাহ ব্যবস্থার প্রচলন করে। রোহিণী এবং কুন্দনন্দিনী দুজনই নিঃসন্তান বাল-বিধবা, সুতরাং বিধি অনুযায়ী তাদের পুনর্বিবাহে বাধা ছিলো না। কিন্তু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তা পারেননি, কেননা, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য উপন্যাস রচনা করেননি, করেছিলেন তখনকার দিনের অসংখ্য বাঙালী পাঠকের জন্য যারা দেহ-মনে সমাজের অন্তরঙ্গ এবং ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও তাঁর প্রবর্তিত এই নতুন বিধিব্যবস্থার

প্রতি বিমুখ। বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর সামনে শাস্ত্রের সমর্থন পেয়ে রোহিণীকে অন্য কোনো পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যেতেন, তা হলে আজ আমরা হয়তো তাঁর দূরদৃষ্টি এবং সৎসাহসের ভূয়সী প্রশংসা করতাম, মহত্ত্বের জয়গান করতাম কিন্তু বলতে পারতাম কি তিনি সমকালীন সমাজে তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন। রোহিণীকে হত্যা করবার সময় গোবিন্দলালের হাত একটুও কাঁপেনি, কিন্তু অনুমান করতে পারি, এই একটি পরিচ্ছেদ লিখতে বসে ব্যথায় টনটন করে উঠেছে মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রের বুক, কেঁপে-কেঁপে উঠেছে তাঁর হাত। তবু রোহিণীর প্রতি করুণা দেখাতে পারেননি তিনি। একেই বলি সাহিত্যিক সততা, লেখকের হৃদয়ে যার জন্ম হয় ইতিহাস চেতনা থেকে।

নৈর্ব্যক্তিক সমাজেরও প্রাণ আছে। সাধারণ মানুষকে নিয়ে যেমন তার কারবার, তেমনি সাধারণ মানুষেরই মতো সে শান্তিপ্রিয়। তাই তার গতিও নিস্তরঙ্গ। ·বাইরে থেকে প্রচণ্ড আঘাত না এলে সে প্রাণে ঢেউ জাগে না। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম নয়, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাঙালীর সমাজ-জীবনে এমন কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেনি, যার প্রশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনীকে নতুনতর কোনো দিকনির্দেশ দিতে পারেন। যেটুকু প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, তা এ-দুই সাহিত্যিকের মানসিক গঠনে। এইজন্যই রোহিণীর মতো মর্মান্তিক পরিনতিতে গিয়ে পৌঁছতে হয়নি 'চোখের বালি'র বিনোদিনীকে। তাই বলে তার পরিণতিও কি কম করুণ! বিহারী ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন শিক্ষিত যুবক, সুতরাং উনিশ শতকীয় উদারতা তার পক্ষে বেমানান নয়, এমনকি, বিধবা-বিবাহের প্রতি আন্তরিক সমর্থন হয়তো তার মধ্যে জন্ম নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলো বিনোদিনীর সংস্পর্শের ফলে। কিন্তু নীরব সমর্থন এবং আন্তরিক ইচ্ছা সব সময়ই মানুষকে জয়ী করে না। এখনও সমাজ তার পথের

কাঁটা। সমাজের তর্জনী-নির্দেশ বিনোদিনীর মারফতই তাকে শুনতে হয়, 'ছি-ছি, একথা মনে করিতে লজ্জা হয়! আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না। ···ছি-ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ কাজ করি; তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।' সেই সমাজ, হৃদয়ের মূল্য তার কাছে কানাকড়ি নয়। মেয়েদের নাকি বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, বিনোদিনীর এমন মুখ ফোটান থেকে বুক ফাটাও যে ঢের ভালো ছিলো। কিন্তু বিধবা-জীবনের এই মর্মন্তুদ ব্যর্থতার আঘাতও বাঙালীর নির্বিকল্প সমাজে, দোলা দিতে পারেনি। না গ্রাম্য সমাজে, না শহর-সমাজে। গ্রাম-জীবন তেমনি নির্লিপ্ত, আর শহর কলকাতা শুধু সেজে উঠতে শুরু করেছে আধুনিক সাজসজ্জায়। সে তার বাইরের রূপ, মানুষের হৃদয়ের ডাক তখনও তার কানে গিয়ে পৌঁছেনি। তাই সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রমা আর রমেশ এক জীবনে মিলিত হতে পারলো না। অথচ পল্লীসমাজ তো মাত্র কয়েক দশক আগের লেখা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কি ভবিষ্যৎ সমাজের সম্ভাব্য রূপটির কথা ভাবতে পারেননি? নিশ্চয়ই পেরেছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁরা প্রলোভনকে ত্যাগ করতে পেয়েছিলেন সমাজ এবং সাহিত্য দুই-এর প্রতিই আন্তরিক বিশ্বস্ততার জন্য। তারপর অনেকগুলো আঘাত সহ্য করতে হয়েছে বাঙালীর সমাজকে পর পর, যার ফলে তার ভিত্তিভূমিতেই প্রচণ্ড ফাটল দেখা দিয়েছে। মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ— একের পর এক এসে এ মোর দুর্ভাগা দেশের সামাজিক, ব্যক্তিক, কিংবা বলা চলে সার্বিক জীবনেই বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। 'সব কিছুরই আবার নতুন করে মূল্যায়ন হচ্ছে। আর আজকের দিনের পাঠকের কাছে বিধবার প্রেম কোনো সমস্যাই নয়। বিনোদিনী, রমা

কিংবা বিহারী-রমেশের মূর্খতাকে সে হয়তো আজ কৃপার চোখে দেখবে। কিন্তু তাই বলে চোখের বালি আর পল্লীসমাজের মূল্য কিছুমাত্র কমে যাবে না। যে-কথা ইতিহাস বলেনি, সে-কথাটাকেই প্রকাশ করে সে রচনা চিরকালের পাঠকের কাছে ইতিহাস হয়ে রইলো। সাহিত্যিক মূল্যমানের কথা না-হয় বাদই দিলাম, কেননা, সে-বিচারের ভার চিরকালের ওপরই ন্যস্ত করে দিয়ে গেছেন লেখক।

একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে, মানুষকে চেনা যায় তার পরিপার্শ্বের বিচারে। নিয়ত ব্যবহারের তারল্যে গুরুত্ব কিছু কমলেও প্রবাদ বাক্যটি অনেকটাই সত্য। অনেকটা বললাম এই কারণে, সমাজ-তাত্ত্বিকরা এ সঙ্গে যুক্ত করতে চাইবেন বংশধারা আর কালপ্রবাহিত ঐতিহ্যকে। বংশানুক্রমে চরিত্রগুণ মানুষের ওপর কতখানি প্রভাবশীল এ সম্বন্ধে নিশ্চিত মত দেওয়া সম্ভব নয়, এবং অদূর প্রাক্তনকে অস্বীকার করার দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, স্পর্শগ্রাহ্য পরিপার্শ্বের অনিবার্য প্রভাবকে এড়িয়ে কখনও কারো পক্ষে নিজেকে বিশেষভাবে তৈরী সম্ভব নয়। গোরা আইরিশ দম্পতির সন্তান, কিন্তু জন্ম ও জাতিত্বের দাবি তার ওপর বিন্দুমাত্রও রইলো না তার জীবন্ত এবং দৈবাগত পারিপার্শ্বিকের জন্য। বলা চলে, গোরা সাধারণ জীবনপ্রবাহে একান্তভাবেই আকস্মিক, সে এক মহান্ রচনাকারের কোনো এক সমস্যাসঙ্কুল মুহূর্তের বাস্তব প্রতীক। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কেবলই কয়েকটি জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। কিন্তু একথা সত্য যে গোরার জন্ম-কাহিনী যদি তার নিজের কাছেই অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে না থাকতো তবে এ-উপন্যাসের পরিণতি এমন বিশ্বমানবিকতার মহত্ত্বে গিয়ে পৌঁছতে পারতো না। সাহিত্যের দরবারে গোরা অন্তত এ-সত্য প্রমাণ করতে পেরেছে যে, যে আচার আচরণের ভেতর দিয়ে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে গড়ে ওঠে, তার পরিচয়েই সে মানুষটির

আসল পরিচয়, তাকে বাদ দিলে তার প্রায় কিছুই বাকি থাকে না। একটা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে গোরার জীবন, কিন্তু তাই বলে সে জীবনের স্বাভবিকতা ও তার সততার অভাব ছিলো না। তার চেয়েও বড় কথা, জীবন সাধনার প্রতি আন্তরিক সততার জন্যই তার জীবনের ট্র্যাজেডি, আর সেই ট্র্যাজেডিরই পরম মহত্ত্বে উত্তরণ। অন্যদিকে এই জীবন-সাধনা সত্য বলেই তার জন্ম এবং জাতীয় ঐতিহ্য গৌণ হয়ে পড়েছে। কারণ হিন্দু পরিবারে জন্ম এবং হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাস তার কাছে এত বেশী সত্য যে, সেইটেই যেন তার আসল বংশধারা এবং ঐতিহ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

তবু বলতেই হবে, গোরার জীবনের মতোই এ-উপন্যাসটিও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি আকস্মিক ঘটনা। বিশেষ একটি ব্যতিক্রমকে কখনও কোনো সাধারণ মতের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রামাণ্য হিসেবে দাঁড় করানো সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। সামাজিক অনুশাসনে মানুষ সাধারণতই জীবন-ধারণের প্রয়োজনে একটি মোটামুটি সাধারণ পন্থাকে বেছে নেয়। সুতরাং সাহিত্যের ভেতরে মানুষকে চিনতে হলে সেই প্রচলিত পন্থার ভেতর দিয়েই চিনে নিতে হবে। উপন্যাসের নায়ক বা উপ-নায়কের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করবে তাদের ব্যক্তিগত মানসিকতার প্রকাশ। পাঠককে চমকে দেওয়াই তার কাজ নয়, বরং তার স্বাভাবিকতায় সে তাদেরই একজন হয়ে উঠবে। মানুষের জীবন একটা দৈব ঘটনা নয়। নরেশের প্রতি বিরাগে মালতী অনেক বড় স্বপ্ন দেখতে পারে, কিন্তু তা স্বপ্নই। শেষ পর্যন্ত নিজেকে বিধাতার শক্তির অপব্যয় ভেবেই তাকে দীর্ঘশ্বাস চাপতে হয়। কারণ সে একান্তই সাধারণ মেয়ে, আর রবীন্দ্রনাথও পারেন না তাকে অসাধারণ করে তুলতে। সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষের পারিপার্শ্বিককে অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেই লেখক তৈরী করে তুলতে বাধ্য হন তাঁর সাহিত্যের প্রত্যেকটি চরিত্রকে। যার ফলে সাহিত্যের মূল্যবিচারে সে রচনা যে স্তরেই জায়গা পাক না, পরবর্তী-

কালের পাঠকদের কাছে তাকে আর অন্তত অসততার দায়ে দায়ী হতে হয় না। কথাটা আজকের দিনেই সত্য নয়, চিরকালের সাহিত্যের পক্ষেই সত্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলা সাহিত্যধারা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সেখানেও এ-সত্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে। আধুনিক কালের সাহিত্য-বিচারে তাদের মূল্য আজ যা-ই নির্ণীত হোক না, একথাটা মানতে কারো বাধা থাকতে পারে না যে, মঙ্গলকাব্যের আখ্যানবস্তু যতই কেননা অ-সাধারণ মানুষ এবং ঘটনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠুক, মানুষ এবং ঘটনা, দুই-ই কিন্তু স্থান পেয়েছে সাধারণ সমাজ জীবন থেকে, এবং এইজন্যই সেখানে বহু অলৌকিক কীর্তির নায়ক এসেও সব পুরুষোত্তমই শেষ পর্যন্ত একেবারে ঘরের মানুষে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে—এমনকি, অদৃশ্য অস্পৃশ্য ঈশ্বরও সেখানে ধরা-ছোঁওয়ার মানুষই, তার বেশী কিছু নয়। সমগ্র মঙ্গলকাব্যধারায় সাহিত্য-মাধুর্য হয়তো ছড়িয়ে আছে সামান্যই কিন্তু ঘরোয়া জীবনের ইতিহাস হিসেবে তার অমূল্যতাকে অস্বীকার করার উপায় কিছু নেই। সে-সাহিত্য মহাকাব্য নয়, কিন্তু উপন্যাসকে যদি আধুনিক কালের মহাকাব্য বলে ধরতে হয়, তবে সেই সমাজ জীবনই যে ঠিক তেমনি-ভাবেই যুগে-যুগে কালে-কালে তার কাছে ধরা দেবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

ঐতিহ্যও তাই অবশ্যম্ভাবী। অতীতকে অগ্রাহ্য করে যদি বর্তমানকে কল্পনা করা অসম্ভব তবে সাহিত্য ব্যাপারেও ঐতিহ্যকে স্বীকার না করে উপায় নেই। একটা দেশ দীর্ঘকাল ধরে যে সংস্কৃতিকে লালন ক'রে তাকে একটি সুস্পষ্ট স্বরূপ দান করে যুগন্ধর সাহিত্যিক তাকেই প্রকাশ করেন সাহিত্যের বাহনে। এই সংস্কৃতিই একটি জাতির আত্মা। সুতরাং আধুনিকতার মোহে তাকে প্রাচীন সংস্কার মাত্র মনে করার অর্থ নিজের দেশ ও জাতিকেই অস্বীকার করা। কোনো বিদগ্ধ লেখকই তাই সদর্থে বৈপ্লবিক হয়েও দেশের সংস্কৃতিকে

ভুলতে পারেন না। এমনকি মোহমুক্ত কবি মধুসূদন দত্তও না। উন্নত কোনো দেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি যদি অনিবার্যভাবে এসে মিলিত হয়, অন্য একটি দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তবে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে না মিশলে কখনই সুফল ফলতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। এমন প্রমাণ দেওয়া বোধ হয় কঠিন হবে না যে, নিজের দেশ ও জাতির শিক্ষাগত ঐতিহ্যের প্রতি অবহেলায় এবং সে সঙ্গে কেবলই মাত্র বিদেশী সাহিত্য শিক্ষাকে সম্বল করে একাধিক রচনাকার ব্যর্থ হয়েছেন এই আমাদেরই সবিশেষ সমৃদ্ধ বাংলাদেশে। দেশীয় ঐতিহ্যের সবটাই ভালো একথা বলায় বিপদ আছে, যেমন বিপদ আছে বিদেশী সংস্কৃতির সব কিছুকেই মন্দ বলায়। তবে একথা ঠিক, দুইটি বিভিন্ন ধারার ত্রুটিহীন মিশ্রণ সম্ভব দীর্ঘ সময়ের অনলস শুশ্রূষায়। সার্থক শিল্পী-সাহিত্যিকের তপস্যা অসীম ধৈর্যে এই সময়টিকে প্রত্যক্ষ করা, তার প্রতিটি মুহূর্তের পরিবর্তনকে মনের মধ্যে তুলে নেওয়া ঘটনামাত্রই কাহিনী নয়, খানিকটা সময়ের একখণ্ড বর্তমান দিয়ে তৈরী হয় না কোনো কাহিনী, তাকে রূপ দেওয়ার আগে-পরে গোপনে-গোপনে কাজ করে-চলে অখণ্ড অতীত আর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ। সুতরাং একটি সরস গল্প দিয়ে মন ভোলানো গেলেও কদাপি মন ভরানো যায়নি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা সময়ের এই নিরবচ্ছিন্ন ধারা-বাহিকতাকে বিশ্বাস করেন বলেই দেশ এবং জাতির ঐতিহ্য স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ে তাঁদের রচনায় আর সে রচনাই সন্ধান দেয় ইতিহাসের নতুনতর পথের। ত্রিকালকে সাক্ষী রেখে সে-কাহিনী শাখা-পল্লবে ছড়িয়ে পড়তে চায় একটি পরিপূর্ণ উপন্যাসের বিস্তৃতিতে, সে তাই, শুধু মানুষের কথাই বলে না, বলে একটা দেশ ও জাতির ইতিহাস এবং সম্ভাবনার কথাও। স্থান কাল ও সর্বোপরি স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের নিয়ামক মানুষের কথাকে সুন্দর সামঞ্জস্যে বিবৃত করাই যদি উদ্দেশ্য হয় ঔপন্যাসিকের, তবে স্থান কাল এবং মানুষ

চিরকালের, সুতরাং তাদের সম্বন্ধে নতুন কথা বলার জন্য নতুন কোনো সামাজিক আন্দোলনের অপেক্ষায় বসে থাকার প্রয়োজন হয় না। সময়ের মতোই সময়ের সঙ্গী সমাজও গতিশীল। অতএব ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সেই সমাজের অলক্ষিত পরিবর্তন যথানিয়মে ঘটেই চলেছে। বাইরের এই পরিবর্তনকে শুধু অনুভব দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে, সজাগ চেতনা যেন সমাজের প্রতিটি আকুঞ্চন-প্রসারণের স্পষ্ট রূপটিকে চিনে নিতে পারে। একজন সাহিত্যিকের এর চেয়ে বড় দায়িত্ব আর কিছু নেই। সাহিত্যসৃষ্টিই তাঁর কাজ, তথাকথিত ইতিহাস রচনা নয়। আজ যদি বাংলা দেশে উপন্যাসের জোয়ার এসে থাকে, তবে তা এই জন্যই বিশেষ আশাপ্রদ ঘটনা যে, আজকের লেখকরা স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে বুঝবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। এই ব্যগ্রতা যে অবশ্যই সুফল দেবে তা নয়, কিন্তু অনিবার্য কারণে দেশের প্রতিটি মানুষের চেতনায় যে অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক কারণে তার কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে রইলো আজকের দিনের অসংখ্য উপন্যাসে। যত সামাজিকই হোক, তার মূল্যও কম নয়। সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিত এখনই না হলেও এখান থেকেই একদিন আমরা যোগাড় করে নিতে পারবো। সেই প্রত্যাশায় বিশ্বাসী হয়ে থাকতে হবে সাম্প্রতিক কালের পাঠকদের।

সাহিত্যের দিকবদল

এমন কোনো মান অবশ্যই আছে যা দিয়ে সাহিত্যের ভালো মন্দ স্থির করা যায়। না হ'লে এত সমালোচনা-সাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছে কেন। তবু, একটা সন্দেহ থাকেই, কেন-না একই কালে, কিংবা কয়েক বৎসরের আগে-পরে যদি বা কেউ কোনো স্বীকৃত কবিকে অনুমোদন করেছেন, অন্যজন হয়তো তাঁকেই নস্যাৎ করলেন। অথচ দুই সমালোচকই প্রথিতযশা। উদাহরণ না দিলে কথাটা ধোঁয়াটে হয়ে থাকবে, তাই একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মেথ্যু আর্ণল্ড অবশ্যই শ্রেষ্ঠ সমালোচক, শেলীও শ্রেষ্ঠ কবি। অন্যপক্ষে টি. এস. এলিয়টকে সমালোচক হিসেবে তুচ্ছ ভাবার প্রশ্নই ওঠে না। অথচ দেখা যাচ্ছে আর্ণল্ড শেলীকে যত প্রশংসা করেছেন, এলিয়ট করেছেন ততটাই নিন্দা। আবার অন্যতর চেহারাও আছে। কিম্বদন্তীর মতো কথাটা ছড়িয়ে গেছে যে একদা স্বয়ং জনসন শেক্‌সপীয়রের কবিতার চেয়েও গ্রে-র কবিতাকে উচ্চতর স্থান দিয়েছিলেন। একদিকে শেলীর যেমন কোন ক্ষতি হয়নি অন্যদিকে শেক্‌সপীয়রেরও নয়। ভার্জিনিয়া উলফ্ একটা অত্যন্ত সত্য কথা বলেছিলেন, সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচলা বিপজ্জনক। কিন্তু এ-বাণী তো ওপরের দুটো উদাহরণের একটার পক্ষেও প্রযোজ্য নয়। তবে কি বুঝতে হবে সমালোচকের খেয়ালের ওপরই নির্ভর করে লেখক কবির ভাগ্য? কিন্তু তাই বা মানবো কেমন করে? একজন যদি মেথ্যু আর্ণল্ড, অন্যজন এলিয়ট। দিকপাল জনসন আজও যুক্তরাজ্য দ্বীপে সংস্কৃতির অধীশ্বর।

হয়তো সময়ের মাপকাঠিটাই আসল। আর্ণল্ড বেনেট বিদগ্ধ অর্থাৎ ক্লাসিকাল সাহিত্যের বড় একটা সহজ সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যে রচনা দীর্ঘদিনের ঝড়ঝাপটা সয়েও শেষ পর্যন্ত টিঁকে গেলো তাই ক্লাসিকাল সাহিত্য। মানতে খুঁত খুঁত করে বৈকি মনটা। যদি না মানি তা হ'লে আরও বিপদ। এলিয়ট 'হোয়াট ইজ ক্লাসিক্স্'-এ একমাত্র ভার্জিল ভিন্ন আর কাউকেই ক্লাসিকাল লেখক বলে স্বীকার করতে রাজী হননি। উভয়েরই যুক্তি আছে এবং দুটোকেই কেউ-না-কেউ সত্য বলে মানতে চাইবেন।

যদি ভারতবর্ষের দিকে তাকাই, তবে ইংরাজী সাহিত্যের আগে-পরে আমাদের দেশে আছে সংস্কৃত এবং বাংলা। বাংলা ভিন্ন এ-দেশে অন্য কোনো সমৃদ্ধ সাহিত্য নেই, এমন অদ্ভুত কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে এ-কথা সত্য যে, সমস্ত মধ্যযুগীয় ধর্ম-সাহিত্যধারাকে অতিক্রম করে আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা যখন সত্যই আধুনিকতার সীমায় উত্তীর্ণ হলাম, তখন দেখা গেলো, অন্যান্য দেশের সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্য অনেকটা বেশী পথই এগিয়ে গিয়েছে। সুদীর্ঘ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা আমার সাম্প্রতিক বিষয়বস্তু নয়। বহু-আলোচিত সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন তুলে কাউকে ব্যতিব্যস্ত করার ইচ্ছাও আমার নেই। কেবলমাত্র প্রয়োজনে এ কথাটুকু বলতে হচ্ছে যে, হঠাৎ কখনও কখনও বিদ্যুৎচমকের মত আশ্চর্য সুন্দর পংক্তি মোহমুদ্গরে ঝলসে ওঠা সত্ত্বেও শঙ্করাচার্য কদাপি কবি নন, অথচ জয়দেবের জয়জয়কার। বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন, অথচ তিনি অবশ্যই সচেতন ছিলেন যে তাঁর নিরীক্ষিত আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে জয়দেব একেবারে দেহিপদপল্লবমুদারম্ করে ছেড়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে সাময়িকভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে গীতগোবিন্দে কি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন? কাব্যগুণ তো!

কিন্তু সেতো বর্ণনা এবং ভঙ্গীনির্ভর। কাব্যের যা সত্য-স্বরূপ সে তো কাঠামোর অপেক্ষা রাখে না। সেখানে ভক্তিস্নাত রসিক পাঠক যে রস পান তার নাম তো নির্ভেজাল শৃঙ্গার। বক্তব্যকে আর একটু বিশদ করা চলতে পারে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি দিকচিহ্ন নাকি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। আদৌ তাকে সাহিত্যপদবাচ্য করা হয়েছে কেন জানি না। যদি পড়া থাকে, তবে পাঠককে আর একবার বাণখণ্ড অংশটুকু স্মরণ করতে অনুরোধ করি। জীবন্ত অশ্লীলতা। গীতগোবিন্দর সঙ্গে বস্তুত তার এইখানেই প্রভেদ। রচনাগুণ, আসলে যার নাম প্রাসাদগুণ, জয়দেবে তা ছিলো। এবং বঙ্কিমচন্দ্র গীতগোবিন্দে প্রশংসনীয় যা দেখেছিলেন তা এই বাইরের দিকটা। গল্প আছে, নিছক গল্পই বটে, মহাকবি কালিদাসের বন্ধু ছিলো জনৈক কুমোর, কবির রচনার প্রথম পাঠক। কুমারসম্ভব শোনাতে বসে কবি লক্ষ্য করলেন, শ্রোতার মনোযোগ নেই। রেগে ছিঁড়ে ফেললেন সমস্ত পুঁথি। অনুতপ্ত বন্ধু খুঁজে পেতে যে কটি টুকরো সংগ্রহ করতে পেরেছিলো, তারই নাম কুমারসম্ভব কাব্য। মহাকাব্য আর হলো না, যেহেতু অলংকার শাস্ত্র মেনে আঠারো সর্গের সবটাই পাওয়া যায়নি। মিথ্যা গল্প সন্দেহ কি, পুরো মহাকাব্যটি আজও বেঁচে আছে। পাওয়া যায় নাকি দক্ষিণ ভারতের দু'একজন পণ্ডিতের গ্রন্থাগারে। পরিত্যক্ত অংশটি আকাশচুম্বী অশ্লীলতার জন্যই অবহেলিত হয়েছে, বিচক্ষণ সংস্কৃত পণ্ডিতদের রচনা থেকেই তা জানা গেছে। আসল কথা, প্রচলিত অলংকারশাস্ত্রের তর্জনীকে অগ্রাহ্য করে, আত্মসমালোচকের ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন কবি। প্রলোভনকে জয় করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর এ-কাব্যও চিরবিলুপ্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে। অসমাপ্ত কুমারসম্ভবেরই মুগ্ধ পাঠক রবীন্দ্রনাথ। সম্পূর্ণ মহাকাব্যটি পড়ার উৎসাহ যদি থাকতো তবে শেষ পর্যন্ত তিনি কি বলতেন, তা আর কোনোদিনই জানা

যাবে না। দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যেবোধের ব্যাপারে, অন্তত তার মূল নীতির দিক দিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথে বিরোধ নেই।

আবার সাহিত্যবিচারে অন্যতর, বলা যায়, বিস্ময়কর তারতম্যও আছে। বরং সে দৃষ্টান্তই অধিক। উনিশ শতকীয় বাংলাদেশের মূর্ত বিগ্রহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি শিক্ষাদীক্ষা আচার আচরণে ইংরাজি এ্যারিস্টোক্র্যাট শব্দের যথার্থ মাননীয় রূপ, আজ আমাদের কাছে ভাবতেও অবাক লাগে, তিনি ছিলেন ভারতচন্দ্রের সংবেদনশীল পাঠক। ভারতচন্দ্র মানে তো বিদ্যাসুন্দর। যদি সময়ের প্রভাব বলে মনে করি, তবে হয়তো একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা, তাঁরই অন্তরঙ্গ মদনমোহন, যিনি সংস্কৃত আর ইংরাজি ভাষায় সমান পারদর্শী এবং দুঃসাহসিক আধুনিকও (বেথুন সাহেব যখন তাঁর স্কুলের জন্য ছাত্রী খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন মদনমোহনই তাঁর দুটি কন্যাকে তুলে দিয়েছিলেন বেথুন সাহেবের হাতে, এ এ সংবাদ ঐতিহাসিক সত্য) তিনিও ছিলেন ভারতচন্দ্রের ভক্ত। শুধু তাই নয়, নিজে তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্যরচনা করেছিলেন। তা হলে তো বলা চলবে না, কেবলই মাত্র ভারতচন্দ্রের রচনাভঙ্গী বা প্রসাদগুণই তাঁকে মোহিত করেছিলো। তবে হয়তো তিনি রচনা-রীতিতে ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করতেন, নতুন করে একই কাহিনীর পত্তন করতেন না। বিদ্যাসুন্দরের বিষয়বস্তুই যে মদনমোহনকে আকর্ষণ করেছিলো তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে ঠিক একই ধারণা আমরা করবো কেমন করে, যখন দেখতে পাই, তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃততর, চিন্তা গভীরতর। শুধু তাই নয়, চরিত্রের এমন কোনো খুঁত তিনি রেখে যান নি, যাকে আশ্রয় করে আমরা তাঁর এই চরিত্রগত বৈষম্যের একটা নির্বিকল্প হেতু খুঁজে বের করতে পারি। আমরা জানি, তখনকার অশালীন পরিবেশের মধ্যে যে শুদ্ধ রুচির পরিচয়কে সযত্নে বহন করে

চলেছিলো তত্ত্ববোধিনী সভা এবং যে রুচিকে বিকশিত করে রেখেছিলো তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন এই উভয়েরই কেন্দ্রনায়ক না হলেও অনমনীয় স্তম্ভবিশেষ। ব্যাকরণ, কথামালা বা বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবাদির কথা বাদ দিলেও, তাঁর আর যে সাহিত্যকর্ম আজও, এবং দীর্ঘকাল, অম্লান হয়ে আছে এবং অবশ্যই থাকবে, তার কি কোনো ক্ষুদ্রতম অংশেও বিদ্যাসুন্দরের প্রত্যক্ষ না হোক অন্তত পরোক্ষ ছাপও পড়েছে? স্তূপীকৃত আবর্জনা থেকে মহাভারতের প্রকৃত সত্যকে খুঁজে বের করার একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বলেছিলেন, সমসাময়িক রচনায় বা বিশেষ চরিত্রের সামগ্রিক কার্যধারা থেকে যদি সমর্থন না পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত। যুধিষ্ঠির কদাপি মিথ্যে বলেননি, মিথ্যে আচরণ করেননি। হঠাৎ সহচরদের উৎসাহে শুধুমাত্র স্বার্থের জন্য তিনি কণ্ঠস্বরকে উঁচুনীচু ভাগ করে বলবেন, অশ্বত্থামা হত ইতি কুঞ্জরঃ এ কখনই হতে পারে না। আমরা দেখেছি, ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রও যুধিষ্ঠিরেরই মতো একমুখী, সেখানে প্রতারণার স্থান নেই। তবুও এ চরিত্র ব্যাখ্যায় অন্তত এ ব্যাপারে, বঙ্কিমচন্দ্রের ফর্মুলা আরোপ করা সম্ভব নয়। অন্য দিকটাও আছে। যদিও ঈশ্বরচন্দ্র কোথাও লিখিত প্রমাণ রেখে যাননি, তথাপি তাঁর জীবনীকারদের দেওয়া সংবাদ থেকে জানা যায়, তিনি আধুনিকতার অন্যতম উদ্গাতা হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ সমকালীন কবি মধুসূদনের কাব্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। সান্ত্বনা পাওয়া যেতো যদি মনে করতে পারতাম, হিন্দুত্বের ধ্বজাবাহী সংস্কৃত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিলো না বিলিতী ভাবনাধারণা আর রচনাশৈলীতে আচ্ছন্ন মধুসূদনের কবিতার বিদেশী গন্ধ সহ্য করা। কিন্তু ইউরোপীয়তার প্রতি অনীহার কোনো প্রমাণ তো ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে নেই। মধুসূদনের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিই। তাঁদের বোঝা

শক্ত নয়। তাঁরা শুদ্ধ ও প্রকৃত অর্থেই প্রাচীনতার ধারক বাহক অভিভাবকমাত্র। সুতরাং মধুসূদন যে তাদের কাছে আমল পেতে পারেন না তা বুঝতে অধিক পরিশ্রম নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোনো অর্থেই এঁদের সহযাত্রী নন। তিনি রাজা রামমোহনের ভাবশিষ্য। শুধু যে ইংরিজী ভাষাটাকেই রীতিমত আয়ত্ত করেছিলেন তাই নয়, ইউরোপীয় ভাবাদর্শকেও এদেশে প্রচার করার চেষ্টায় তিনি নিঃসন্দেহে একজন অগ্রণীও ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকায় কেবলমাত্র বার্কলিকে বাদ দিয়ে সমস্ত পাশ্চাত্য দর্শনকে তিনি অনায়াসে স্থান দিতে পেরেছিলেন, অন্যপক্ষে ঐতিহ্যবাহী সত্যিকারের ভারতীয় হয়েও সে পাঠ্যতালিকা থেকে বেদান্তদর্শনকে বাদ দিতে তাঁর কিছুমাত্র বাধেনি। সুতরাং বিদেশী পোষাকের দোহাই দিয়ে মধুসূদনের কাব্যের প্রতি তাঁর বিরূপতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা নিরর্থক।

রবীন্দ্রনাথে সম্ভবত এ-সমস্ত সমাধানের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের নিষ্ঠুর সমালোচনা করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে কাব্যের নাম স্পষ্টোচ্চারণে ব্যক্ত না করেও তিনি সে কীর্তিকে নিতান্তই বালকোচিত ব্যাপার বলে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য যদি রবীন্দ্রজীবনের সাক্ষী হয় তবে বললে ভুল হবে না, মেঘনাদবধকাব্যকে গ্রহণ করার মতো মানসিকতা রবীন্দ্রনাথের ছিলো না। বলা ভালো, সে মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়াই তাঁর মতো কবির পক্ষে অসম্ভব। বরং তিনি যে বলেছিলেন, যুগ যুগ ধরে যে সত্য দেশের মানুষের হৃদয়কে মথিত করে উজ্জ্বল হয়ে আছে, তাকে অগ্রাহ্য করার মধ্যে বাহবা থাকতে পারে, সত্য নেই, সেকথার মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্রের জবানটিকেও যেন চেষ্টা করলে খুঁজে পাওয়া যায়। তাহলে পাঠ্যতালিকা থেকে বেদান্তদর্শনকে বাদ দেওয়ার পেছনে যদি কেউ

এই সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি, বলাই বাহুল্য, ব্যর্থ হবেন। কারণ, তার পেছনে আসল যা কারণ ছিলো তা একান্তই ব্যবহারিক। নয়তো বেদান্তদর্শন থেকে ছাত্রদের দূরে সরিয়া রাখার মতো নির্বুদ্ধিতা স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রেরও ছিলো এ কথা পরম দুঃখেই মেনে নিতে হবে।

অন্তত প্রমথ চৌধুরীর মতো ভারতচন্দ্রের মধ্যে বিশেষ এক নাগরিকতাকে ঈশ্বরচন্দ্র খুঁজে পাননি, এবং তাও জয়দেবের সঙ্গে তুলনায়। ঈশ্বরচন্দ্র যদিও ছিলেন একান্তই ভারতীয় আচার্য তবে প্রমথ চৌধুরী অংশভাগে অধিককতর ইয়োরোপীয়। প্রমথ চৌধুরীর দিক থেকে বক্তব্যের সারার্থ বোঝা কঠিন নয়। বিষয়বস্তু নয়, ভারতচন্দ্র বাংলাদেশকে সত্যই একটি অভিনব ভাষা দিয়েছেন, যে ভাষা গ্রাম থেকে মার্জিত হয়ে উঠে এসেছে নগরসভ্যতায়। একেবারে প্রাত্যহিক জীবনের মুখের ভাষায়। প্রসাদগুণের প্রাচুর্য নিয়েও জয়দেব যা কখনই করতে পারেননি। সংস্কৃত আমাদের মুখের ভাষা নয়। তবু একটা প্রশ্ন থাকে, নগরসভ্যতার লক্ষণ নিয়েও সভ্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের ওপর তো কৈ ভারতচন্দ্র কিছুমাত্র প্রভাব রাখতে পারেন নি। সন্দেহ নেই যে সমগ্র মধ্যযুগীয় কবিকুলে ভারতচন্দ্র অদ্বিতীয় ছন্দকুশলী। কিন্তু কোনটা বাংলা কবিতার ছন্দ? সংস্কৃতসাহিত্যকে ধুয়ে মুছে যত ছন্দচাতুর্য তিনি দেখিয়েছেন, তাতে বাংলা ছন্দের স্থান নেই, ভিক্ষার মূর্তিটাই স্পষ্ট। আর যাই হোক, কেবল ভঙ্গী দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চোখ ভোলানো যায় নি। পয়ারের পায়ের বেড়ী ছিঁড়ে মধুসূদন যা গড়ে তুলেছিলেন, তা বস্তুত পয়ারেরই রূপভেদমাত্র। রবীন্দ্রনাথ এত অল্পেই তুষ্ট হবেন তাই কি আশা করা যায়? তিনি বাঙালী কবি, তাই একান্তভাবেই চাই বাংলা ছন্দ। নেই যদি তো গড়ে নিতে হবে, তিনি গড়েই নিলেন। বাংলা কবিতা নিত্যনব স্রোতোধারায় ভাসিয়ে দিয়ে গেলো বাংলাদেশকে, সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর ওপর। নগরসভ্যতাও

রইলো, গ্রামসভ্যতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হলো না। বাংলা কবিতায় এই প্রথম, সম্ভবত আজও পর্যন্ত এই-ই শেষ, ব্যাপক অর্থে সমগ্র বাংলা তার চেহারায় তার ব্যবহারে সত্যিকারের নাগরিকত্ব পেলো, কোনো বিশেষ দেশের নয়, সমস্ত বিশ্বের বিশ্বনাগরিকত্ব—স্বকীয় মহিমায়। প্রমথ চৌধুরী হয়তো ভুল করেন নি। ভারতচন্দ্রের দানকে স্বীকার করেও বলতে বাধা নেই তাঁর নাগরিকত্ব সীমাহীন নয়।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন খাঁটি অর্থে ভাষার কারবারী। তাঁর প্রতিটি কথা এমনি ঝকঝকে উজ্জ্বল যে স্বাভাবিকভাবে পাঠকের কাছে তিনি একমাত্র বিদগ্ধ লেখক বলেই পরিচিত হয়ে আছেন। অথচ সর্বত্রই যে তিনি পরম যত্নে বৈদগ্ধ্যকেই রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাও নয়। আসলে বিশ্বাসঘাতকা করেছে তাঁর ভাষা, তাঁর বাচনভঙ্গী। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী শুধু সেই পাঠকেরই যোগ্য লেখক, যিনি বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে তার গণ্ডীর বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের, বিশেষত ইংরাজী এবং ফরাসী সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করতে সক্ষম। মূলত প্রমথ চৌধুরী এই বৈদগ্ধ্যকেই খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতচন্দ্রের মধ্যে—যদিও তা সাহিত্যের পক্ষে একেবারেই বাইরের পোষাক, যা তার ভাষা, তার রচনাশৈলী। অমার্জিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে তারা একটা মার্জিত রূপ দিতে পারে মাত্র। কিন্তু ঐখানেই যে সাহিত্যের শেষ তাকে সম্মানের উচ্চ চূড়ায় তুললেও সে তার প্রতিষ্ঠাকে বজায় রাখতে পারে না। ভারতচন্দ্রও পারেন নি।

গদ্য-পদ্যের বাংলা ভাষাকে প্রথম যৌবন থেকে যৌবনোত্তর সীমায় পৌঁছে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ পরম সাবলীলতায়। ভারতচন্দ্রে যা ছিলো রবীন্দ্রনাথে তা আছে, প্রমথ চৌধুরী যা চেয়েচিলেন, রবীন্দ্রনাথে তাও আছে। ভাষার এমন সমৃদ্ধ রূপ, জানি না, অন্য কোনো দেশের একজন মাত্র লেখকের হাতে এমন পরিণত সম্পূর্ণতায় এসে পৌঁছতে

পেরেছে কিনা। সম্পদ-সমৃদ্ধির যে বিপদ এ-ক্ষেত্রেও তার সম্ভাবনা আছে কি না ভেবে দেখা যেতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে টলস্টয় নির্মম ভাষায় শেকস্‌পীয়রকে আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলো নাট্যকারের ভাষা। তাঁর মতে ভাষা ব্যবহারে শেকস্‌পীয়র সমতা রক্ষা করতে পারেন নি। সব চরিত্র একই ভাষায় কথা বলে। যে ভাষায় হ্যামলেট তার মানসিক দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করছে ঠিক সেই একই ভাষায় অবলীলায় কথা বলছে শাবল হাতে ঐ অশিক্ষিত লোকটা, যার কাজ শুধু মরা মানুষের জন্য কবর খোঁড়া। যদি আগে থেকে জানা না থাকে তবে কিছুতেই বলা যাবে না, নাটকের কোন চরিত্র ঐ কথাগুলো বলছে। চারশ বছর আগেকার ইংলণ্ডে এ-ত্রুটিকে হয়তো ত্রুটি বলেই গ্রাহ্য করা হতো না কিংবা কেউ হয়তো এ-দিকটা চিন্তার মধ্যেই আনেনি কখনো। কিন্তু টলস্টয় দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছিলেন, সাহিত্য ব্যাপারে এ-একটি লক্ষ্য করার মতোই ত্রুটি। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যও পরম ঐশ্বর্যময়। অধিকন্তু তিনি সমৃদ্ধতর সংস্কৃত সাহিত্যের যোগ্যতম উত্তরসূরি—যে সাহিত্য ভাষা-ব্যবহারে, বর্ণনার নিপুণতায় এমন এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে গেছে, যা বস্তুত অলকাপুরীর অনির্বচনীয়তা, আমাদের নিত্যকার ব্যবহারে পরিম্লান মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে যা কখনও ছড়িয়ে থাকে না। সুতরাং বিপদের সম্ভবনা থেকেই যাচ্ছে এবং এ-দিকে যে কারো নজর পড়েনি তাও নয়। যতদূর মনে পড়ে, চতুরঙ্গ উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে একেবারে শেষে প্রশ্ন করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, এ-ভাষায় কি কথা বলে কেউ? উত্তর অবশ্য তিনি নিজেই দিয়েছিলেন, অন্তত একটি বিশেষ বাড়ীতে কথোপকথনে যে এ ভাষা ব্যবহার হয় তা তাঁর অজানা নয়। শেকসপীয়র প্রসঙ্গে ব্যাপারটাকে প্যারাডক্স বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সত্যিই এখানে সংশয়ের অবকাশ নেই। শেকস্‌পীয়রের হাতে যা ছিলো, কিংবা তাঁর যাদুহাতে যা

আরো বেশী সুন্দর হয়ে উঠেছিলো, তা শুধু সাহিত্যেরই ভাষা। দর্শক বা পাঠককুলের দৈনন্দিন জীবনের সুখে দুঃখে তৈরী হয়ে ওঠা সহজ সরল নয় সে ভাষা। আশ্চর্য শিল্পী সেকস্‌পীয়র, ভাষাটাই তাঁর সব নয়। তার অন্তরালে প্রবাহিত অসীম রহস্যময় মানবজীবনই তাঁর আসল উপজীব্য। টলস্টয়ের আপত্তিটা বাইরের জিনিস, সেকস্‌পীয়রের হৃদয়কে সে স্পর্শ করে না। এ দিক থেকে যদি ভেবে দেখি তবে বুদ্ধদেব বসুর মীমাংসার মধ্যেও আমরা একটা গভীর সত্যের সন্ধান পাবো। প্রহসন কমেডীর প্রশ্ন ওঠে না, নাটক সম্ভবত এ আলোচনায় সঙ্গত নয় এইজন্যে যে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ জগৎও নয় জীবনও নয়, জগৎ এবং জীবনের দর্শন চিন্তা অথবা তার তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। কাব্যনাট্য কাব্যকে যতখানি প্রকাশ করার সুযোগ পায়, জীবনের প্রতি তার মনোযোগ ততটাই কম, যদিও সেকস্‌পীয়র তাঁর অপার দক্ষতায় সে অসম্ভবকেও সম্ভব করেছেন। অন্যতর রচনাবলীতেই যেন রবীন্দ্রনাথকে আমরা অনেক কাছের মানুষ বলে চিনতে পারি, আত্মার আত্মীয় বলে মানি। সেখামে তো তিনি কবি নন, ফুলের তোড়ায় সাজাননি তাঁর কথাকে। বুদ্ধদেব বসু যদি জেনে থাকেন, একটি পরিবার তাঁর কথিত ভাষায় কথা বলেন, তবে এতদিনে আমরাও জেনেছি, সেই একটি পরিবারের মুখের ভাষাই তাঁর হাতের ছোঁয়ায় সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে, এবং তারই মধ্যস্থতায় সে ভাষাই আজ বাংলাদেশের হাজারো পরিবারের মুখের ভাষা। যদি তা না হতো, যদি বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই বাংলা রচনারীতি আবর্তিত হতে থাকতো, তবে কল্পনা করতেও কষ্ট হয়, ঔপনিষদীয় দর্শন নিয়েও আমরা কি করতাম। সন্দেহ কি যে শরৎচন্দ্র আমাদের আরও কাছে নেমে এসেছেন, একেবারে অন্দরমহল জুড়ে তাঁর সংশয়হীন উপস্থিতি। কিন্তু সেকি শুধুই রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যবাহী রচনাভঙ্গীর অনুগ্রহে? তার চেয়েও বেশী, রবীন্দ্রনাথ

বাংলাদেশের লেখকদের নিজের মুখের বুলিতে কথা বলতে শিখিয়েছেন।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, নবীন যুবক রবীন্দ্রনাথকে কেন মেঘনাদ-বধ কাব্য আনন্দ দিতে পারেনি। সেখানে তিনি আসল কারণটিকে গোপন করেননি। শব্দের অর্থাৎ ভাষার আড়ম্বরই তাঁকে বিড়ম্বিত করেছিলো। পরিণত বয়সে তিনি আরও দেখেছেন, সূর্যপ্রতিম আর চিরনন্দিত সত্য সেখানে আচ্ছন্ন হয়েছে অনাবশ্যক বিরূপতায়। অথচ বাংলাদেশের আর একজন স্বীকৃত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের চোখে এই কাব্যই ধরা দিয়েছে একেবারে ভিন্ন চেহারায়। সেখানে ভাষা একটা বড় প্রশ্ন নয়, হলেও তা অর্থহীন নয়, মূল বিষয়বস্তুর অঙ্গাঙ্গী সহচর হয়ে আছে সে ভাষা, বাইরের আবরণমাত্রই নয়। মোহিতলাল কাব্যের, সে-সঙ্গে কবির অন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখেছেন, রাবণের হাহাকার যেন কবির নিজেরই হৃদয়মথিত ক্রন্দনরোল। এ এক নতুন আবিষ্কার। একান্ত সমবেদনায় কাব্যটিকে আস্বাদন করে মোহিতলাল লক্ষ্য করেছেন, এখানে শাব্দিক ডঙ্কা নিনাদটাই ঘোষিত কঠিন আস্তরণকে ভেদ করতে না পারলে চলবে না। পারলে নতুন একটা দিগ্বলয় উদ্ভাসিত হবে পাঠকের চোখে। তিনি দেখতে পাবেন, সমস্ত ইউরোপ লুট করে, বিপুল আড়ম্বরে নৌকো সাজিয়েছিলেন মধুসূদন সাগর পাড়ি দেওয়ার অদম্য কামনায়, কিন্তু যাত্রাশেষে নৌকো এসে ভিড়লো যেখানে সে তো তাঁর সেই চিরপরিচিত কপোতাক্ষের ঘাট, যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ ভাসাতে আসে জনপদবধূরা। বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনকে নতমস্তকে স্বীকার করেছিলেন, পাণ্ডিত্যাভিমানী প্রবীনদের বৈপরীত্যকে অগ্রাহ্য করেও, আর সুদীর্ঘকাল পরে আর একবার মোহিতলাল প্রণাম জানালেন কবিকে তাঁর একান্ত স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করে। এ কথা সত্য যে, মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে একা।

সুদীর্ঘ মধ্যযুগকে অতিক্রম করে এসেছে যে সাহিত্য সেখানে এ কবির খোরাক মেলেনি। তাই তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হয়েছে ইউরোপের নানা ভাষার রসসম্ভার। এবং সেখানেই তার শেষ। না দেহে, না আত্মায়কোনো দিক দিয়েই কোনো প্রভাব আর রেখে গেলেন না তিনি পরবর্তীকালের বাংলাসাহিত্যের জন্য। কে না স্বীকার করবে বৃত্র-সংহার কিংবা রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস আর যাই হোক মেঘনাদবধের যোগ্য বংশধর নয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছেন বটে কিন্তু অন্তঃমিলকে বর্জন করে নয়। কেবলমাত্র রাজা ও রাণী এবং বিসর্জনে মধুসূদনের রীতি রক্ষিত হয়েছে কিন্তু ছান্দসিক পাঠক জানেন, দুই-এর চরিত্র একেবারেই ভিন্ন জাতের। তারপর আর মধুসূদনের রচনা অনুসৃত হলো না, না আঙ্গিকে না মানসিকতায়। কবি মধুসূদন তাই যুগসন্ধিক্ষণের বিস্ময় হয়েই রইলেন।

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিদগ্ধ সাহিত্যের মানবিচার, আর্নল্ড বেনেটের সে সিদ্ধান্ত, মনে হচ্ছে, কালের দিক থেকেই গ্রহণীয় নয়। নিরবধি কাল সন্দেহ কি, বিপুলা চ পৃথ্বীও বটে, শুধু ভবভূতি বাণভট্টকে সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অপেক্ষায় তপস্যামগ্ন হয়ে থাকতে হয়নি। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের কাদম্বরী চিত্র সত্যিই কিছু ডক্টরেটের থিসীস নয়। সময়ের পরীক্ষাকে গ্রাহ্য না করেই সে গ্রন্থ ক্লাসিকাল। তা হলে সাহিত্যিকের দায়িত্ব কোথায়? সে সম্পর্কে এলিয়ট যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন তা শুধুই বিস্ময়কর নয়, প্রায় অসম্ভবও। তাঁর মতে, সাহিত্যিক যখন কলম হাতে নেবেন তখন তাঁকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এ কেবল তাঁর একার রচনা নয়, সে সময়ে তাঁর কলমে এসে ভীড় করেছেন তাঁর দেশের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতেরও সম্ভাবনাময় রচনাকারেরাও। অর্থাৎ তিনকালের ভাবনা ধারণাকে দায়িত্বের মতো ধারণ করতে হবে লেখককে। বলা বাহুল্য, ব্যাস-হোমার-রবীন্দ্রসুলভ এ ক্ষমতার অধিকারী সাহিত্যিক অগুনতি

হতে পারে না। তথাপি সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব বলে একটা কথা আছে, যাকে আশ্রয় করে কেউ কেউ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন, নাই বা হলেন তাঁরা ব্যাকরণের হিসাব মেনে ক্লাসিকাল।

দান্তের ভূমিকা অসাধারণ। ভালো লাতিন জানতেন তিনি, সে সঙ্গে প্রমাণিত সত্য যে সাহিত্যপ্রতিভা ছিলো তাঁর আশ্চর্যজনক। তবু তিনি প্রতিষ্ঠিত লাতিন ভাষার আশ্রয় নিলেন না, কেননা সে ভাষায় রচিত সাহিত্য কেবলই মাত্র উচ্চাঙ্গ সাহিত্য, যা অগণিত জনগণের ধরাছোঁয়ার বাইরের। তাহলে বহু ভাষাভাষীর গড়া ইতালীর কোন বিশেষ ভাষা তাঁর আশ্রয় হবে? ঘুরে বেড়ালেন সমস্ত ইতালী, সঞ্চয় করলেন সমানভাবে ব্যবহৃত শব্দের সমষ্টি, উৎসাহ পেলেন দক্ষিণ ইতালীর ক্রুবাদুরদের চারণগীতি শুনে। মিশ্রণের দক্ষতায় তৈরী হলো অবাক করা ভাষা। অনুমান করি, সেদিন লাতিন ভাষার রত্নাকররা বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন প্রাণ খুলে। কিন্তু অমর হয়ে রইলো ডিভাইন কমেডি। ভাষাতাত্ত্বিকের কৌতূহল যতখানিই হোক, আমাদের কাছে তার মূল্য বেশী নয়। নতুন একটা ভাষার পত্তন করেছিলেন বলে দান্তেকে গৌরব দেওয়া চলতো, তিনি নিজে কিন্তু সেইখানেই থেমে থাকেননি। কোনো একটি পজিটিভ 'বিশেষ' তাঁর ভিত্তি ছিলো সন্দেহ কি, সাহিত্যকর্ম তো তারই প্রকাশিত রূপ। বিচক্ষণদের মতে সেন্ট টমাসের দর্শন ছিলো সেই ভিত্তিভূমি। হতে পারে, সে দর্শন স্কলাসটিসিজ্‌মের তত্ত্বনির্ভর, কিন্তু তাতেই দান্তে খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির পথ। প্রতিভা তাঁকে সাহায্য করেছে, ক্রিশ্চিয়ানিটির শুকনো মরুভূমির মধ্যে তাঁকে চোখ বেঁধে ঘুরে বেড়াতে দেয় নি—যা অনেক অক্ষম লেখককেই করতে হয়েছে।

এইটেই মূল কথা। পিরান্দেলোর রচনায় স্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকতে পারে কিন্তু তার দেশবাসীরা সেখানে খুঁজে পেয়েছেন ক্রোচেকে। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কেন না স্থূল উদ্দেশ্যকে গোপনতার গভীরে

রেখে বাইরের আবরণের অর্থাৎ কাহিনীতে প্রাণসঞ্চার করাই সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম। নিপুণহস্ত সেকস্‌পীয়র এ-বিষয়ে শীর্ষস্পর্শী। তাঁর কোনো র নার প্রেরণা হিসেবে আছে কি কোনো কালের বিশেষ কোনো দর্শন? তাঁর ট্র্যাজেডীতে বা তাঁর কমেডীতে? এলিয়ট এখানেও তাঁর অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। পরোক্ষভাবে সেনেকার প্রভাব পড়েছে শেকস্‌পীয়রের নাটকে। সম্ভব, কেন না কিং লীয়ার বা ওথেলোতে নিঃস্পৃহ স্টোইসিজ্‌ম্‌কে খুঁজে পাওয়া শক্ত ব্যাপার নয়। তা ছাড়া, এলিজাবেথীয় যুগে ইংলণ্ডে, বিশেষত, ইংলণ্ডের সাহিত্যমণ্ডলে সেনেকার প্রভাব ছিলো অপ্রতিহত। শেক্‌স্‌পীয়রেও যে তার ছোঁয়া লাগেনি, কেমন করে বলবো! নাটক রচনার শিল্পশৈলী তাঁর হাতের পুতুল, তাই উদ্দীষ্ট বক্তব্য কাহিনীকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারেনি কখনও। আসল কথা, সাহিত্য যখন থাকে দর্শনের বিকল্প হয়ে তখনই তার সম্মান, যখন একাকার হয়ে যায় তখনই সাহিত্যের সর্বনাশ—এও এলিয়টেরই উক্তি।

প্রয়োজনবোধে সাহিত্য বলে যদি স্বীকার করি তবে বলতেই হবে সুদীর্ঘ মধ্যযুগীয় সাহিত্যমণ্ডলের অধিক অংশভাগই আচ্ছন্ন করে আছে মঙ্গলকাব্যগুলো। স্বপ্নে পাওয়া নির্দেশে রচিত লোকাচারমুখী কতগুলো অবাস্তব গল্পকথা—ছন্দোবদ্ধ পাঁচালী। ধর্মও আছে, বিশ্বাসও আছে, সবটা মিলিয়ে নিতান্তই ধর্মবিশ্বাস, নামান্তরে যা অন্ধবিশ্বাস-মাত্র। অথচ এমনিই একটি সম্প্রদায়গত বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই তো গড়ে উঠেছিলো তুলনায় তুচ্ছতর অংশভাগ বৈষ্ণব পদাবলী। মঙ্গলকাব্যের দুর্ভাগ্য নিয়ে তাকে তো অচিরকালে বিলীন হয়ে যেতে হয়নি। বস্তুত সেখানে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো, ধর্ম নয়, একটি সুস্পষ্ট দর্শন, যা যুগান্তরের ভাবনায়-ধারণায় মূর্তিমন্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল পদাবলীকারদের চোখে। ইউরোপীয় সাহিত্যরীতির দোহাই

দিয়ে তাকে আমরা ইমোশনাল বলতে পারি, কিন্তু তার মহত্বকে অস্বীকার করবো কিসের জোরে। তাই-বা কেন, ইউরোপীয় সাহিত্যতত্ত্বই তো প্রমাণ করে দিয়েছে ইমোশোন বিপরীতে দাঁড়ালেও ইন্‌টেলেক্টের থেকে খাটো নয়। আভিধানিক অর্থে ক্লাসিক্‌সের বিপরীতার্থক শব্দ ইমোশন। এলিয়টও দেখেছি, ইনটেলেকচুয়াল এবং ইমোশনাল দুটো শব্দকে সমান্তরাল রেখে তাদের সমান মর্যাদা দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। যদি বৈষ্ণব পদাবলী শতাব্দী কালব্যাপী তার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরে থাকে, তবে সে মেধাকে ব্যস্ত না করে হৃদয়কেই না হয় উদ্বেল করুক, ক্ষতি নেই—যেহেতু সাহিত্যবোধের পক্ষে হৃদয়েরও কর্তব্য আছে। অবশ্য যদি সে সাহিত্য সত্যিকারের হৃদয়শীল হয়— সদর্থে ইমোশনাল।

বাংলা সাহিত্য বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের পাশাপাশি দাঁড়ানোর যোগ্যতা পেলো মাত্রই সেদিন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এমন কিছু দূর অতীত নয়, যে ঝাঁকে-ঝাঁকে অনেক সৎ এবং মহৎ সাহিত্যিকের নাম করা যাবে এক নিঃশ্বাসে। তবু দু'চার জন আছেন এরই মধ্যে যাঁরা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের রচনা তুলনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন, সফলও হয়েছিলেন। সময়ের ভাবনাধারণার চিহ্ন আর সকলের মতো তাঁরও রচনায় ফুটে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই। নিয়তির অঙ্গুলিহেলনে মানবচরিত্র তার গতি পাচ্ছে, নিশ্চিত পরিণতিতে গিয়ে পৌঁচোচ্ছে, এ-সত্য তিনি আদর্শবাদীর মতোই বুঝেছিলেন এবং বুঝিয়েছিলেন। প্রায় শতাব্দীকালের ব্যবধানে সমালোচক মোহিতলাল স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলেন, শেকস্‌পীয়রের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র সেকস্‌পীয়রের মতোই পেয়েছিলেন কিন্তু পথ বদলালেন তিনি অন্যতর প্রেরণায়। ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন, সেকস্‌পীয়রের পাশে গিয়ে আর তাঁকে দাঁড়াতে হলো না।

তার জন্য হায় আফশোষ করেননি মোহিতলাল, কারণ শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আপন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। এই বিশ্বাসই দার্শনিক বিশ্বাস, দর্শনের বিশেষ সংজ্ঞায় তার পরিচয় নাই থাকুক। আর রবীন্দ্রনাথ। আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অমার্জিতকেও তিনি মার্জিত করেন, শিক্ষিতকে করেন দ্রষ্টা।

যুগসন্ধিক্ষণের ত্ব'জন স্মরণীয় কবি ভারতচন্দ্র এবং মধুসূদন। একজন অস্তমিত, অন্যজন উদিত। মূল্যায়ণের নিরীখে তাঁরা কখনও হয়েছেন নন্দিত, কখনও-বা নিন্দিত। ভারতচন্দ্র রাজসভার সভাকবি, রাজার অনুগ্রহে তাঁর স্বর্গসুখ। সেদিনকার আশালীন সমাজের গুটিকয় ভদ্রজন তাঁর শ্রোতা। তাঁরা নাগরিক। তাই তাঁর কবিতায় আছে নাগরিকতার ছাপ। কিন্তু তার চেহারা কেমন। পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি। শব্দের ঝঙ্কারে আর ছন্দের আন্দোলনে তাই তাঁর কবিতা সদামুখর। কুশলী শিল্পী ভারতচন্দ্র। আবরণকে তিনি আভরণ দিয়ে সাজাতে জানেন। বস্তুত আঙ্গিকের আশ্রয়ে যে বাতাবরণ তিনি সৃষ্টি করে তুলেছেন, তার অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে প্রাচীনতর সাহিত্যেও, সেখানে মুকুন্দরামের ভোলানাথ শিব নেংটো হয়ে নাচেন গ্রাম্য এক গৃহপ্রাঙ্গণে। তফাৎ এই, মুকুন্দরাম নাগরিক নন, তিনি কথাকে সাজাতে জানেন না। অন্যপক্ষে মধুসূদনের দান কোনখানে? তাঁর বিপ্লবে, তাঁর বিদ্রোহে। সমস্ত প্রাচীনতার বিরুদ্ধেই তাঁর আক্রমণ। এমনকি স্বয়ং বাল্মীকিকেও তিনি হাতে হাঁটিয়েছেন। উভয়ের সত্য কোনখানে? কোনখানেই নেই। দর্শন যদি হয় সত্যদৃষ্টি তবে সত্যিকার সাহিত্যে সে দৃষ্টির আলো পড়বেই। যেখানে তার অভাব সেখানেই ফাঁকি।

সে ফাঁকি তাই কখনও না কখনও কারো না কারো কাছে ধরা পড়ে। গতানুগতিকতায় বিশ্বাসী পাঠক আচমকা জেগে ওঠে। আসল কথা, এবং সম্ভবত সাহিত্য সম্পর্কেও মূল কথা সাহিত্যকে বাঁচতে হলে চাই, তার দৃঢ় ভিত্তিভূমি যাকে বলতে পারি পজিটিভ্ ফিলজফি—তা আদর্শবাদীই হোক কিংবা হোক বাস্তববাদী।

ঐতিহ্য বনাম বিচ্ছিন্নতাবোধ

তাও আজ অন্তত দশ বৎসর আগের কথা তো বটেই। লিখতে লিখতে হঠাৎ কলম থামিয়ে প্রেমেনদা, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হঠাৎই জিজ্ঞেস করে বসলেন, আমরা কি সব ভুল লিখতাম ?

আমি হতবাক।

একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখে তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, নাহলে আজকালকার ছেলেদের লেখা বুঝি না কেন ? স্বীকার করতেই হবে, হয় আমরা এতকাল ভুল লিখেছি, নয় তো ওরাই ভুল লিখছে।

সেদিন জবাব দিতে পারিনি, আজও যে কিছু জবাব আছে তাও নয়। তবু একটুকরো ইশারা এতদিনে অনেকটাই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাই খানিকটা সাহস করে বলতে পারছি, জেনারেশন গ্যাপ। কথাটা আমার নয়, অধুনাকালের লেখকদের। কিছু কিছু পাঠক দেরও বটে।

কিন্তু শব্দটার যথার্থ অর্থ কি ? হাতের কাছে আছে অক্সফোর্ড পকেট ডিকশনারী, সেখানে শব্দটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। নাই যাক, বুঝতে কষ্ট হয় না। অর্থাৎ তোমায় আমায় মিল নাই—মিল নাই।

কিসের মিল ? একই সমাজ সংসারে একই বংশরক্ত যেখানে প্রবহমান, সেখানে সমাজ ব্যবহারে একটুখানিও মিল থাকবে না কেন ? সামাজিক অনুষ্ঠানে যার তিলমাত্র অভাব দেখা যায় না, শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার দৃষ্টান্তটা পর্বত প্রমাণ হবে কেন ? আসল কথা, অমিলের প্রশ্নটাতো ঐতিহ্যগত ? তা যদি হয় তা হলে জেনারেশন

গ্যাপ বোঝাতে বলতে হবে ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শেষ কথা।

ল্যামার্কিয়ান-ডারুইন থিয়োরী মেনে যদি মিশিং লিঙ্কের সঙ্গে জেনারেশন গ্যাপের তুলনা করি তবে তুলনাটি অতীব হাস্যকর হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ছাড়া অন্য কিছু তুলনীয়ও হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না। ল্যামার্কের মিশিং লিঙ্কের ব্যবধান নিদেনপক্ষে সহস্র শতকের। আর জেনারেশন গ্যাপ? ঐতিহাসিকরা মোটামুটিভাবে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসরে একটি জেনারেশন ধরে থাকেন। অর্থাৎ প্রমত্তা পদ্মা নদীর সঙ্গে রাস্তার পাশের নর্দমাটির তুলনা! মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসরে ঐতিহ্য কতটুকু ব্যাহত হতে পারে? যে ঐতিহ্য গড়ে উঠতেই অন্তত শতাধিক বৎসর সময় নেয়, মাত্র এই এক টুকরো সময়ের মধ্যেই তা লয় পেয়ে যাবে, এটা পাগলের উক্তি হতে পারে, কখনও সত্য হতে পারে না।

আর একটা তুলনাও চলতে পারে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মত, ভাষার গতি অতি মন্থর। অন্তত একশটি বৎসর সময় লাগে একটি শব্দ লুপ্ত হতে, এবং মুখের ভাষায়ও একটি শব্দ তার আদল বদলায় প্রতি কুড়ি মাইল অন্তরে। সেদিক থেকেও যদি বিচার করি তবে দেখতে পাচ্ছি, ঐতিহ্য বদলের বেলাতেও তার গতি ভাষার মতই মন্থর হতে বাধ্য, অন্তত যদি মন্থরতরও না হয়।

তবে জেনারেশন গাপের প্রশ্নটা ওঠে কোনখানে? সাহিত্য ব্যাপারে ঐতিহ্যকে যদি মানবোই না, তবে শুরুটা করবো কোথা থেকে? একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

ফিল্ডিং ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাসের জনক। নতুনতর পথের আবিষ্কারের দম্ভে এমন ঘোষণাও তিনি করতে পেরেছিলেন, উপন্যাস রচনায় যে কোন পন্থা গ্রহণ করতে তিনি ভবিষ্যতে কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু একথাটাকে তিনি আমল দিতে চাইলেন না যে প্রকৃতি আপন গতিতে চলে, তাকে যথেচ্ছাচার ব্যবহার করা চলে না। মানুষ

শুধু পারে প্রকৃতির গতিকে সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণ করতে। ল্যুবক সে কথাটাই মনে করিয়ে দিলেন পরবর্তীকালের ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের। কিন্তু এ বিষয়ে মোটামুটি একটা শেষ সিদ্ধান্তে আসার শেষ চেষ্টা করলেন ই. এম. ফর্স্টার। অনেকানেক দৃষ্টান্তের অবতারণা করে তিনি উপন্যাস-রচনা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতির আভাস দিয়ে দিলেন। বোধ হয় সহজেই বলা যায়, ইংরাজী উপন্যাস রচনা আপন গতিতে একটা বিশেষ সাহিত্যাদর্শকে সেই থেকে মেনে আসছে। আশ্চর্য ব্যতিক্রম হাকস্লিও সে পথ থেকে বিচ্যুত নন। সুতরাং সেখানেও সত্য অর্থে ট্রাডিশন বলে যাকে জানি তা যথারীতি সম্মান পেয়েই আসছে। তাই বলে কি ইউলিসিস নেই ইংরেজী সাহিত্যে ? আছে, শুধু ইংরেজী সাহিত্য কেন, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেই এমনিতর দু' একটি ঘটনা ঘটে থাকেই। তবু মনে রাখতে হবে, ডাবলিনার আর ইউলিসিস্ এক জিনিস নয়। কাহিনী বা রচনাভঙ্গীর বিচারে প্রথমোক্ত গ্রন্থে জেমস্ জয়েস প্রচলিত ধারাবাহী, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে নন। কেন-না ইউলিসিস্ সম্পূর্ণতই একটি রূপক উপন্যাস, যার রীতিপদ্ধতি অবশ্যই অন্যতর হতে বাধ্য। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র বাণভট্টকেই সম্ভবত ঠিক এই ধরনের ব্যতিক্রম বলা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস তো অন্তত এরকম সিদ্ধান্তের পক্ষেই সায় দেয়। সমাজনিয়মে ব্যতিক্রম যদি বিশেষ ঘটনা বলে স্বীকৃতি পায়, তবে সাহিত্য ব্যাপারেও এ-রকম দু' একটি ব্যতিক্রম ঘটনাই। এরা ভিন্ন দৃষ্টিতে সমালোচনার বস্তু। এবং এসব গ্রন্থ চিরকালই অননুকরণীয়।

ঐতিহ্য সম্পর্কে টি. এস. এলিয়টের সুবিখ্যাত মতামত পাঠক-মাত্রেরই জানা সুতরাং তার পুনরালোচনা এখানে নিরর্থক। তবুও, এ-প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি যে আশ্চর্য একটি উক্তি করেছিলেন, এখানে তার পুনরুক্তি করা হয়তো চলতে পারে। তাঁর অভিজ্ঞ অভিমত

সেখানে এই যে, (একান্তভাবেই য়ুরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য), কলমে হাত দেওয়ার সময় প্রতিটি লেখককেই এ-কথাটাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তিনি যখনই যা রচনা করছেন, তখন তা আর তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি নয় ; তাঁকে মনে রাখতে হবে তাঁর ঐ বিশেষ কলমটিতে এসে ভর করেছেন কেবলই মাত্র তাঁর দেশের প্রাক্তন এবং সমকালীন লেখকরাই নয়, সমগ্র য়ুরোপের লেখকরা, তদুপরি সে-কলমে ভর করে আছে আগামীযুগের সাহিত্যিকরাও। এ-বোধ যদি না কোন লেখকের মধ্যে সদা-জাগ্রত থাকে, তবে তাঁর পক্ষে সাহিত্যিক হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। শুধু এই একটি বাক্যকে মেনে নিলে একজন সাহিত্যিকের দায়িত্ব কোন সুদূরবিসারী সাহারার গিয়ে পৌঁছয়, সে কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত না করলেও যে-কোনো লেখকের কাছেই তাকে ভয়াবহ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এলিয়ট শুধু ঐতিহ্যকে স্বীকারই করছেন তা নয়, তাঁর ধারণায়, প্রতিটি লেখক একদিকে যেমন ঐতিহ্য বাহী, অন্যদিকে তিনি ঐতিহ্যস্রষ্টাও। এ বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু কথাটাকে যদি আংশিকভাবেও মানতে হয়, তবে ঐতিহ্যকেও স্বীকার না করে উপায় নেই। আর সেক্ষেত্রে জেনারেশন গ্যাপ মানে তো বিচ্ছিন্নতা। অথচ আজ বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে আলোড়নের ঢেউ উঠেছে তাকে মিথ্যা বলার দায়িত্ব কে নেবে ?

কমবেশি একশত বৎসর আগে সনাতনপন্থীদের বিরক্তিভাজন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, যতীন্দ্রনাথ সিংহ ইত্যাদি সমালোচকরা তো বটেই, এমনকি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো কবি-সাহিত্যিকও খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রতি। রবীন্দ্রনাথের অপরাধ ? তিনি সাহিত্যগঠনে গতানুগতিকতাকে পরিহার করে নিত্য নবীন নতুনত্বে বাংলা সাহিত্যকে রঙিন করে তুলছিলেন। বস্তুত তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, নবগঠিত বাংলা ভাষা তখনও পর্যন্ত সমস্ত ভাব-ভাবনাকে প্রকাশ করার মতো নিজস্ব কোন একটা সুষ্ঠু ভাষার

সন্ধান পায়নি। সে যে তখনও তার সংস্কৃত মায়ের স্তন্যপান করে লালিতপালিত হচ্ছে এ-কথাটা প্রথম আবিষ্কার করলেন তো রবীন্দ্রনাথই? কিন্তু তবু তিনি যথেচ্ছাচারের পথে যাননি। বাংলা ধ্বনিকে হাতের পুতুলের মতো খেলিয়ে তিনি একের পর এক তৈরি করে তুললেন বাংলা গদ্য এবং কাব্যের বাকভঙ্গী তথা কাব্যছন্দ। সে-সঙ্গে একে একে খুলে যেতে লাগলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সিংহদ্বারগুলো। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের ভাষা দিয়ে গড়ে তুললেন বাংলা সাহিত্যকে। একে আমরা ঐতিহ্য পরিপন্থী বলে নিন্দা করতে পারি, কিন্তু আর কেউ ভুল করেও বলতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ নিজে যে পথটিকে আবিষ্কার করেছিলেন, কদাপি তিনি সে পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। যা কিছু ব্যতিক্রম, তা শিল্পশৈলীতে—যা আরও একটি নতুনতর,অবিষ্কার। শেষ কথা, শেষাবধি আপন ঐতিহ্যেই স্থির ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রত্যক্ষভাবে বাংলা সাহিত্য আর একবার নতুন করে মোড় নিলো কল্লোল কালিকলমের যুগে। ইতিহাসের হিসাবে সে খুব বেশি দিনের কথা নয়। নতুন দিনের সাহিত্যিকরা সারা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় ও সুবিধা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের থেকেও বেশি, রবীন্দ্রপন্থাকে পরিহার করে নতুনতর দিকদর্শনের পরিচয় দিতে চেষ্টা করলেন আর একবার। সে সম্বন্ধে আলোচনার সময় সচেতনভাবে মনে রাখতে হবে ততদিনে রবীন্দ্রনাথের মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হলেও তখনও তিনি পুরোপুরি অস্তমুখী নন। শরৎচন্দ্রের মতো চন্দ্রপ্রভাকে বাদ দিলে সেদিনকার বাংলা সাহিত্যকে একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত নামে অভিহিত করা যায়—রবীন্দ্রনাথ। তরুণ সাহিত্যিকরা অনভিজ্ঞ নন, তাঁরা জানেন, এতবড় প্রতিভার ছত্রছায়ায় লেখক হওয়া সম্ভব, সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়। কেন-না, অনুকরণের অনুকরণ যে সাহিত্যকে কোন পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়ায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে সমগ্র

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যসাহিত্যে। সুতরাং এই আপাতমনোহর ছত্রছায়া থেকে সরে যেতে না পারলে নতুনতর সৃষ্টির কোন সম্ভাবনাই নেই। প্রথম পর্যায়ের উত্তেজনায় রুখে দাঁড়ালেন তাঁরা রবীন্দ্রপন্থার বিরোধিতায়। তাঁরা দেখলেন, দেখাতে চাইলেন, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যত বড় লেখকই হোন, তাঁরা আদৌ ভিক্টোরীয় মর‍্যালিটির বাইরে যেতে পারেন নি। সুতরাং তাঁদের সেই গণ্ডী পার হতেই হবে। কেবলমাত্র কতগুলো জমিদার, মধ্যবিত্ত নিয়ে বাংলাদেশের সমাজজীবন নয়, তার বাইরেআছে অনেক পতিত, অনেক শ্রমিক-মজুর—চাষা-ভুষা, যারা সমাজের অঙ্গ হয়েও সাহিত্যে স্থান পেলো না। তাছাড়া আছে এমন অনেক কিছু যা মর‍্যালিটির বিচারে পরিত্যাগযোগ্য হলেও যাদের বাদ দিলে সমাজজীবনের সম্পূর্ণতাকে সাহিত্যের দরবারে তুলে আনা সম্ভব নয়। এ দুই-এর সংমিশ্রণে প্রকাশিত হতে লাগলো পাঁক, বেদে, কয়লাকুঠি, পটলডাঙ্গার পাঁচালীর মতো একান্ত বাস্তব রচনাবলী। তরুণ পাঠকরা সমাজের পূর্ণ চিহ্নটিকে হাতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সে সঙ্গে রবীন্দ্র-বিরোধিতাও সম্পূর্ণতা পেলো।

কিন্তু ভুল ধরা পড়তে বেশি দেরি হলো না। দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সবই লক্ষ্য করলেন, নবীন লেখকদের সামর্থ্যকে অভিনন্দনও জানালেন। আবার নীরবও রইলেন না। সাহিত্যের স্বরূপে নির্দিষ্ট হলো যথার্থ সাহিত্যের সংজ্ঞা, আর আধুনিকতার স্বরূপ প্রকাশ পেলো শেষের কবিতায়। শেষের কবিতা তাই আজও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যুগান্তর। সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়লো আধুনিক লেখকদের আধুনিকতার ভ্রান্তি। অধুনালুপ্ত একটি ভালো বই বেরিয়েছিলো 'সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ'। তাতে বুদ্ধদেব বসু অকুণ্ঠায় সে কথাগুলো ব্যক্ত করেছিলেন একটিমাত্র বাক্যে। যতটা মনে পড়ে তার বয়ানটা ছিলো মোটামুটি এই রকম : আমরা যখন আধুনিকতা আধুনিকতা বলে চীৎকার করছিলাম, তখন

রবীন্দ্রনাথ মুচকি হাসলেন, বসলেন কলম টেনে, বেরিয়ে এলো শেষের কবিতা, আমরা আর একবার হোঁচট খেয়ে পড়লুম।

শরৎচন্দ্রও চুপ করে বসে থাকেননি। একটি চিঠিতে শেষ প্রশ্ন রচনা সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়ে জানালেন, আধুনিক সাহিত্য কেমনটি হওয়া উচিত তারই পরিচয় শেষ প্রশ্ন। শেষ প্রশ্ন সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত হয়তো আজও মেলেনি, কিন্তু সেদিন যে তা অবিমিশ্র ছিলো না তার প্রমাণ আছে। একদিকে আধুনিক লেখকদের কেউ কেউ তাকে অজস্র গালমন্দ দিয়েছে, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, তাতে চূড়ান্ত আধুনিকতা তথা প্রগাতশীলতার পরিচয় পেয়ে মানবেন্দ্রনাথের মতো চিন্তাশীল প্রগতিবাদীও নির্দ্বিধায় বলতে পারলেন, শেষ প্রশ্ন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। মোট কথা, বিরোধটা মিটলো, আর তার ফলশ্রুতি এই : ঐতিহ্যকে বজায় রেখেও যে সাহিত্যের পরিধিকে বিস্তৃত করা যায় তার হদিশ পাওয়া গেলো।

আজ আবার বাংলা সাহিত্য নতুন করে মোড় নিতে শুরু করেছে। অজুহাত, সমাজের অবক্ষয়। বাইরের চালচলনে সমাজের যে চেহারাটা আমাদের কাছে প্রকাশিত তা সম্পূর্ণ নয়, এর ভেতরে ভেতরে যে ক্ষয়ের চিহ্নগুলো লুকিয়ে আছে, সদ্যবিগত বাংলা সাহিত্যও এতকাল তাকে লুকিয়েই রেখেছিলো। তাতে সাহিত্য সম্পূর্ণতা পায়নি। সুতরাং তাকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে হলে এই ক্ষতচিহ্নগুলোকে উন্মুক্ত করে ফেলতে হবে। প্রমাণের অভাব নেই। ধরা যাক একটি বিশেষ গল্পকে। ব্যবসা করতে হলে, তাকে বাড়িয়ে তুলতে হলে, অনেক কৌশলের প্রয়োজন। ঘুষ থেকে আরম্ভ করে মদ, মায় নারীমাংসও নাকি সংগ্রহ করে দিতে হয়। এই যদি সত্য হয় তবে কি বলতে হবে কলকাতার যাবতীয় ব্যবসায়ীরা এই নোংরা রীতিতেই চলছে? হলপ করে বলতে পারি, সব ব্যবসায়ীরাই অস্বীকার করবেন, এ মিথ্যা। অথচ ঘটনাটার সবটাই মিথ্যার ওপর ভিত গড়েনি। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই খণ্ডিত

সত্য, সুতরাং সে কোন সমাজপন্থাকে চিহ্নিত করে না। একটা টাইপ চরিত্রকে কেন্দ্রবিন্দু করলে যেমন কোন উপন্যাস বা গল্পই সত্য হয়ে উঠতে পারে না, এ-ক্ষেত্রেও সেই একই কথা খাটে, সমাজের বিশেষ একটি ক্ষেত্রে সংঘটিত সামান্য ব্যতিক্রম না সমাজ, না সাহিত্য, কাউকে সম্পূর্ণতা দেয় না। যা দেয়, তা লেখকের খণ্ডিত দৃষ্টিরই পরিচয়।

শরৎচন্দ্র একদা একটি চিঠিতে এমনতর মতই প্রকাশ করেছিলেন, সংসারে অনেক ঘটনাই ঘটে যা সত্য হলেও সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। উক্তিটি যত ছোটই হোক, তার একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা এখানে হয়তো অবাস্তব বলে মনে নাও হতে পারে। হেগেল বলেছিলেন, আংশিক সত্য কদাপি সত্য নয়। তার উত্তরে অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা কিয়ের্কেগার্ড জানালেন, প্রতিটি অংশ সত্ত্ববান, সুতরাং তারও সত্যতা আছে। সাহিত্য, ছোট গল্পের কথা বাদ দিলে, সমগ্রের কথাই বলে। অন্য পক্ষে ইউক্লিড তো প্রমাণই করেছেন, অংশ কখনও সমগ্রতার সমান হতে পারে না। তা যদি সত্য হয়, তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ-সত্যকে মানা চলবে না কেন? সামাজিক অবক্ষয়কে যত বড় করেই দেখানো হোক না, তা সমাজশরীরের অংশ মাত্র। এবং ছোটকে বড় করে দেখালেই তা বড় হয়ে যায় না। তা যদি স্বীকার করি তবে সাহিত্য সম্পর্কেও স্বীকার করতে হবে, সমাজের সমগ্রতার বিচারেই তার ক্ষুদ্র ক্ষতটিকে দেখানো উচিত, নয় তো এক টুকরো ক্ষুদ্র অংশভাগের মূল্য বস্তুত মূল্যহীন।

শরৎচন্দ্রের কথাটাকে আজ প্রাচীনপন্থীর অভিমত বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে তা নিঃসন্দেহেই বোঝা যায়। অর্থাৎ এবারকার আক্রমণটা আসছে উলটো দিক থেকে। সামনে কোন অমিতপ্রতিভা পথ আগলে দাঁড়িয়ে নেই যে তার বিরোধিতার প্রয়োজন আছে। অথচ চিরাচরিত প্রথায় সাহিত্য রচনার স্পৃহাটাও গেছে। তাই

নিরুপায় লেখককুল খণ্ডিত দৃষ্টি নিয়ে সমাজের সামান্যতম খণ্ড অংশভাগকে বড় করে দেখাতে চাইছেন। তাই প্রবহমান সাহিত্যের নিয়মিত পাঠকদের কাছে এসব রচনা, যত সুন্দর করেই বলা হোক না, সুন্দর বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। যারা আপত্তি তুলতে চাইছেন তাদের প্রতি লেখকদের তথা সমর্থকদের যুক্তি জেনারেশন গ্যাপ। কিন্তু তাতে কি প্রমাণিত হয়? একদিন রবীন্দ্র-বিরোধিতায় সাহিত্যের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হয়েছিলো, আজ ঐতিহ্য-বিরোধিতার ফলে সেই নন্দিত সাহিত্যই সঙ্কীর্ণ পথে চলতে শুরু করেছে। সেজন্যই অন্নদাশঙ্করের সেই বিখ্যাত উক্তিটির পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন, সেখানে তিনি বিলু নামের কোন এক কাল্পনিক সাহিত্যিককে পরামর্শ দিচ্ছেন: বিলু, তুমি অনেক কথা বলার আর্টটা শিখেছ, এবার কথা-না-বলার আর্টটা শেখো।

প্রেমেনদার সেদিনকার সখেদ প্রশ্নের জবাব আজ এভাবে ছাড়া অন্য কোনরকমে তো ভাবতে পারছি না। ভুল কোন পক্ষেরই নয়। শুধু বলতে পারি, দুই কাননের পাখি একটি রজনীর জন্য একটি শাখার শাখী হয়েছিলো, কিন্তু মিল নাই, মিল নাই, তাই আর রাখীবন্ধনও সম্ভব হলো না।

নায়িকা-প্রতিমা

সেনাপতি আবাজী সোনদেব বিজাপুরের কল্যাণ প্রদেশ জয় করবার সময় শাসনকর্তা মুল্লা আহ্‌মদের সুন্দরী তরুণী পুত্রবধূকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিবাজীর কাছে তাঁর ভোগের উপহারস্বরূপ। শিবাজী কিন্তু বন্দিনীর দিকে একবারমাত্র তাকিয়েই বলে উঠেছিলেন, 'আহা, আমার মা যদি এঁর মত হতেন তা হলে কি সুখের ব্যাপার হত। আমার চেহারাটাও হত কত সুন্দর।' মায়ের মতই সম্মান করে বন্দিনীকে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর শ্বশুরাশ্রয়ে। ছত্রপতির জীবনে এ একটি হঠাৎ-ঘটনা নয়, নারীজাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা ছিল সর্বজনবিদিত সত্য। চরিত্রের এই সততারই সুযোগ নিয়ে পরবর্তীকালে পালিয়ে বেঁচেছিলেন কারিঞ্জার শ্রেষ্ঠ ধনী। শিবাজী যখন সে শহর আক্রমণ করেন তখন এ ব্যক্তি স্ত্রীলোকের পোশাক পরে পেরেছিলেন পালিয়ে যেতে। তিনি জানতেন, যেখানে শিবাজী স্বয়ং উপস্থিত সেখানে স্ত্রীলোকের শরীর স্পর্শ করবে এমন অসম সাহস কোনও মারাঠা সৈন্যের থাকতে পারে না।

শেষ মধ্যযুগের মোগল আমলে একজন হিন্দু রাজা এ চারিত্র্যকে অকস্মাৎ অর্জন করেন নি। ইতিহাসের উষালগ্নে বিষয়বিবাগী দার্শনিক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর অমৃতত্ত্ব-সন্ধানী স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে অবহেলা না করে ব্রাহ্মণে দীক্ষা দিয়েছিলেন, এবং সার্ধ উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম ডিগ্রীলাভের সম্মানকে অভিনন্দন জানিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অচেনা মেয়ে চন্দ্রমুখী বসুকে।

অন্যায় অপরাধ সভ্যতারই যমজ ভাই। এবং অন্যায়ের প্রতি

সাধারণ মানুষের আকর্ষণও সহজাত। কিন্তু প্রবহমান সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সামান্য যে কয়জন মানুষের ওপর এসে পড়ে, তাঁরা তাঁদের কর্তব্যে ভুল করেন না। যাজ্ঞবল্ক্য থেকে ঈশ্বরচন্দ্র— ভারত-পথিক সকল ঋষির দৃষ্টিতে তাই নারীজাতি এমনি এক পরম মহিমায় উদ্ভাসিত হতে পেরেছিল।

স্বভাবতঃই নারীর এই মহিমময় রূপটির সঙ্গে পরিচয় ছিল রবীন্দ্রনাথেরও। কিন্তু তার যে আরও একটা রূপ আছে, যা সৌন্দর্যের অতীত, বা অপরিবর্তনীয় এবং অনির্বচনীয়, যাকে অনুভব করা যায়, অথচ যা প্রকাশিত হয়েও চিরঅসম্পূর্ণ, রবীন্দ্রনাথ তাকেও বন্দনা করলেন সমান শ্রদ্ধায়। নারীজাতির সম্পূর্ণ চেহারা ধরা পড়ল মাত্র এ কয়টি মন্ত্রের মত বাণীতে।

'মেয়েরা দুই জাতের, কোনও কোনও পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝঙ্কারের অপেক্ষায়, যে-ঝঙ্কারে বেজে বেজে ওঠে সর্বদেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।'

শরৎচন্দ্রে জ্যাঠাইমা, বড়দিদি, মেজদিদিরা যদি মা, তবে রমা অচলা ষোড়শী প্রিয়া, চন্দ্রমুখী সাবিত্রীও তাই, তাদের অজস্র স্খলন-পতন সত্ত্বেও। সম্ভবত নারীরূপে সম্পূর্ণতা পেয়েছিল তাঁর রাজলক্ষ্মী, যে একই সঙ্গে মা এবং প্রিয়াও।

বাংলাসাহিত্য কেন, বস্তুতঃ বিশ্বসাহিত্যে যা কিছু মহৎ সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হয়েছে," সেখানে শত লাঞ্ছনাকে অতিক্রম করে সকল নারীচরিত্রই শেষ পর্যন্ত যে পরিচয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তা হয়তো মা কিংবা প্রিয়া কিংবা দুই-ই। অসংখ্য উদাহরণের অবতারণা নিরর্থক কারণ বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আছে আজ কম বেশী সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই।

কথা ওঠা বিচিত্র নয়, সহজ সরল মাতৃস্নেহ মাতৃভক্তি বা পাতিব্রত্য যদি হয় কথাসাহিত্যের উপজীব্য তবে তা আর যাই হোক যথার্থ সাহিত্য বলে আখ্যায়িত হওয়ার সৌভাগ্য সে হারাবে, কেন না হেন সাহিত্য সামাজিক সুনীতির পরাকাষ্ঠা হয়েও স্বাদগন্ধহীন ব্যর্থতা ভিন্ন আর কিছুই লেখককে উপহার দেবে না। মহত্ত্বের ছাড়পত্র পাওয়া উপন্যাস মাত্রই প্রাথমিক পর্যায়ে অসামাজিক সম্পর্কের বর্ণাঢ্য ছবি শুধু। এবং তা যখন মহাকাব্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রূপে বেঁচে থাকতে পেরেছে তখন এ সময় আর নতুন করে এ প্রশ্ন তুলে লাভ কি?

সম্পর্কটা অসামাজিক হলেও কোন ঘটনাই সমাজবহির্ভূত নয়। দুটো ব্যাপারকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। রোহিণী, বিনোদিনী, রমা। বিধবার প্রেম—বলাই বাহুল্য, অবৈধ, সুতরাং ব্যভিচার। বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝি, বৈপরীত্যের আলোয় সত্যকে চেনাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এ কথাকে তো অস্বীকার করা যাবে না যে, বালবিধবা মঞ্জুলিকারা নিশ্চয়ই সুযোগ খুঁজে বেড়াবে পুলিনদের সঙ্গে ফরাক্কাবাদ চলে যাওয়ার, যদি পিতারা হয় সংস্কারে অন্ধ এক-একজন সমাজপতি। বিনোদিনী রমাদের পিতা ছিল না, কিন্তু ছিল তার চেয়েও নিষ্ঠুর একটি সমাজ। তার অবয়ব নেই, কিন্তু আছে অনিবার্য বিধান। কুন্দ হয়তো আত্মহত্যা করতে পারে, কিন্তু যে ওই পথটাকেই একমাত্র পথ বলে বেছে নিতে চায়

না, সে কি করবে ? যা করতে পারে বিনোদিনী রমাও তাই করেছে। ফরাক্কাবাদও যায় নি, আত্মহত্যাও করে নি, চলে যেতে চেয়েছে বিশ্বনাথের কোলে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অতীতের সবকিছুর মত মনটাকেও কি তারা অবহেলায় ত্যাগ করে যেতে পারবে। ব্যভিচারের নীচতাকে অতিক্রম করে এইখানেই তারা উত্তীর্ণ হয়েছে প্রেমের স্বর্গে—যার স্মৃতিতে প্রিয়ার রূপটাই উদ্ভাসিত হয়, যার বৈধব্য নেই, যে বস্তুতঃ অপাপবিদ্ধ হৃদয়মাত্র।

সমাজটা কিন্তু রইলই, সঙ্গে নিয়ে তার অনমনীয় ধর্মধ্বজাটিকে। সাংখ্যদর্শনকার যতই কেননা আত্মার অনশ্বরতার সঙ্গে প্রমাণ করুন দেহ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক মানুষের পক্ষে সমাজের পীড়ন দেহকে ভেদ করে যে আত্মা পর্যন্তও পৌঁছয় তাতে আর সন্দেহ কি। হাজার মতের কিম্ভুত মিশ্রণে তৈরি যে সমাজদেহ, তাতে উদারতার স্থান থাকুক আর নাই থাকুক, শক্তি আছে প্রচণ্ড, যার সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হতে হয় রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের মত অসাধারণ শক্তিধর মনীষীদেরও। ক্ষীণপ্রাণ দু-একটি নারীহৃদয় তো কোন্ ছার। দু-একটি তাই রক্ষা, নয়তো সমাজের এই ভয়ানক শক্তি আসত কোথা থেকে।

কথাসাহিত্যের অসামাজিকতা সমাজের ভেতরকার ব্যাপার হলেও, জেনে রাখা প্রয়োজন সেইটেই সমাজ-জীবনের সাধারণ এবং নিত্য ঘটনা নয়। ঈডিপাস কমপ্লেক্স একটা কমপ্লেক্স বটে, তার উপস্থিতিটাও হয়তো সত্য, কিন্তু প্রকাশটা এতই ব্যতিক্রম যে তাকে সমাজনীতি বলে মনে করলে অবশ্যই ভুল করা হবে। নরনারীর প্রেমটাও তেমনি। এ জিনিসটি সহজ এবং স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এই প্রেমের ভেতরের অসামাজিকতাটা অনর্গল নয়। দু-একটি ঘটনাকে তাই দুর্ঘটনা বলেই মেনে নেওয়া যায়। এই সংখ্যাল্পতাতেই তো সমাজের এত শক্তি, এত তার বিক্রম।

কিন্তু আশ্চর্য, এই দু-একটি দুর্ঘটনাই বস্তুত সাহিত্যের প্রধান

উপাদান। এমনটা কেন হয়! সাহিত্য যদি সমাজরূপেরই প্রতিফলন তবে তার স্বাভাবিকতাটাকেই না আমরা খুঁজে বেড়াব সাহিত্যের মধ্যে। অথচ সেখানে যা ঘটছে, তা যেন নিয়মেরই ব্যতিক্রম। আনা-কারেনিনা কখনও একটা সমাজের বিশেষ কোন সময়ের সমগ্র নারীজাতির প্রতিভূ হতে পারে না, যদি হয় তবে সে সমাজ নির্বীর্য পঙ্গু। সাবিত্রী কিরণময়ীও অবশ্যই সমাজের নারীজাতির প্রতীক নয়। তবু তাদেরই মধ্য দিয়ে আমরা একটি বিশেষ জাতির বিশেষ সময়ের বিশেষ সমাজের আসল চেহারাটাকে প্রত্যক্ষ করি এ কথাও তো সত্য। তা যদি হয়, তবে সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে কোথায় একটা স্বতঃবিরোধ আছে, খোলা চোখে যার সন্ধান পাওয়া সহজ নয়।

সন্ধান পান সাহিত্যিকরা, কিন্তু সকল সাহিত্যিক নয়। তার কারণ আছে। প্রথম স্থূল কারণ যেটি তা হল সাহিত্য ও গল্পকাহিনী এক জিনিস নয়। কবির মনোভূমি যদি অযোধ্যার চেয়ে সত্য না হয়, তাহলে কবি হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আসল কথা, ঋষির ভূমিকা নিতে হবে লেখককে, সত্যদৃষ্টি থাকা চাই তাঁর। কাহিনীটা উপলক্ষ মাত্র। এইখানেই সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত সম্পর্ক এবং অন্তর্বিরোধের সূত্রপাত। কিন্তু তারও আগে আরও একটি কথা আছে। সমাজ-সংসার তার নিজের নিয়মে চলে, অব্যাহত সে গতি, কিন্তু ঋষিপ্রতিম সাহিত্যিক একই সঙ্গে অনেক জন্মান না, এমন কি একের সঙ্গে অপরের ব্যবধান সময়ের দিক থেকে হয়তো বা অনেকখানিই দূরের। এই ব্যবধানটুকুকে ভরে রাখে সমাজ তার নিত্যদিনের সংস্কার দিয়ে। তা জমা হয়, স্তূপীকৃত হয়, অভ্যাসের বশে তার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না সাধারণ মানুষ। সে দায়িত্বও তার নয়। কিন্তু পুঞ্জীভূত আবর্জনা বিষ ছড়ায়, ক্ষয় করে সমাজেরই নিজের হৃদ্‌পিণ্ডকে। বিদ্রোহ দেখা দেয় ভেতরে ভেতরে,

বাইরে তার চেহারাটা ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু ক্ষোভটা জমা হতে হতে প্রচণ্ড বিস্ফোরকের প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি থাকে সে। প্রয়োজন শুধু সামান্য আগুনের। সে আগুন আছে ফ্লবেয়ার কিংবা আমাদের শরৎচন্দ্রর হাতে। তাই বহুদিনের জমে ওঠা নারীহৃদয়ের ক্ষোভকে মুহূর্তে ফেটে পড়তে দেখি মাদাম বোভারি কিংবা সাবিত্রী কিরণময়ীর অনভ্যস্ত আচরণে। নিত্যদিনের চোখ দিয়ে অনিত্যকালের সত্যকে প্রত্যক্ষ করি আমরা, আর মনে করি, এ সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রম, এ কখনই সত্য নয়। অথচ একদিন যখন তাকে সত্য বলে জানি, তখন দেখি, সাহিত্যসত্যে আর সমাজসত্যে কোনও বিরোধ নেই। বস্তুত সমাজমানসের প্রতিফলনই ঘটেছে নিঃসংশয় সাহিত্যে।

এ অঘটন কেমন করে ঘটে সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেরই তা জানা আছে। কথিত আছে, কাব্যের প্রথম শ্লোক নাকি কবির মুখে জন্ম নিয়েছিল শোকেরই করুণ অনুভূতি থেকে। গল্প হতে পারে, এ নিয়ে তর্ক করব না, কিন্তু ভেতরের সত্যটি চিরকাল স্বীকৃত হয়ে আসছে দেশে দেশে। অন্তরে যদি সত্যিকারের বেদনা না জাগে তবে কেবলই মাত্র চোখ-ধাঁধানো চাতুর্য দিয়ে সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়। অন্তত সে সাহিত্য চিরকালের সত্য বলে ছাড়পত্র পায় না। শিল্পীর হাতের কার্টুনও জন্ম নেয় এই হৃদয়মথিত বেদনাবোধ থেকে, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মুখে এমন কথা শুনেছি।

অর্থাৎ সহজ অর্থে মানুষের প্রতি ভালবাসা সাহিত্যকর্মের প্রথম শর্ত। এখানে তত্ত্ব নেই, যুক্তি নেই, সমস্যা যদি থাকে, গায়ের জোরে তার মীমাংসার দায়িত্বও নেই কোনও। কিন্তু সমবেদনার সামান্য অভাবেই সাহিত্যকীর্তির সমস্ত সৌধটি ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

আমাদের দেশের হৃদয়সন্ধানী পরম দরদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র গত হয়েছেন অনেকদিন। এখনও দেশের মানুষ আছে, আছে তার সমাজ। ইতিমধ্যে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে,

পটভূমি পৃথিবীর যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়েছে অবাধ জলধারার মত। কিন্তু মানুষের প্রতি রচনাকারের ভালবাসার পরিচয় তারা বহন করছে কিনা সংশয় আছে সে প্রশ্নের, অন্তত গত কয়েক দশকের বাংলা কথাসাহিত্য পাঠকদের মনে এ ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে।

বলবীর্যের যত প্রদর্শনীই দেখানো হোক না, প্রাণের সহজ ধারাটিকে সহজ সাবলীলতায় বইয়ে আনে পুরুষ নয়, মেয়েরাই। এ প্রাণ-প্রবাহটারই যেন আর সন্ধান পাচ্ছি না আজকের দিনের বাংলা কথা সাহিত্যে। অথচ নারী ভিন্ন উপন্যাস হয় না, ছোট গল্প হয় না—যদি হয়, উদ্দেশ্যমূলক রূপক-কাহিনী সে, উদ্দেশ্যের মতই তার আবির্ভাবটাও ব্যতিক্রম মাত্র। সংসারে বাস করে আমরা শুধুই দেখছি বাংলাদেশের সাহিত্যসংসার জাঁকিয়ে বসে আছে যে সব মেয়েরা তারা কেউ শুষ্কতা দূর করে না, অভাব ভরে দেয় না, তাদের রহস্য যেমন গভীর নয়, মায়ামন্ত্রও নয় তেমন মধুর। কিংবা সব মিলিয়ে তারা ঠিক উলটো দিকেই মুখ করে বসে আছে। অর্থাৎ, সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এখন আর বাংলার সাহিত্যসংসারে মা নেই, প্রিয়া নেই। যারা আছে তারা পুরুষকে আকর্ষণ করে, কোলে টেনে নেয় না; রহস্যের আবরণ না রেখে উন্মোচিত হয় পুরোপুরি। এরা কেউ বা বাইজী, কেউ বা বেশ্যা, নয়তো এমন কিছু যার কোনও বিশেষ সংজ্ঞা নেই। যার নিজেরই অন্তরে নেই প্রাণের আবেগ, প্রাণপ্রবাহ বইয়ে দেবে সে কিসের জোরে।

লেখকদেয় দিক থেকে এর উত্তর অবশ্য আছে, এমন কি যুক্তিও প্রায় অখণ্ডনীয়ই। শুনি, সমাজের কাঠামোটা ক্রমশঃই ধসে যাচ্ছে, রাষ্ট্রিক পরিবর্তন এত দ্রুত লয়ে চলছে যে, তার সঙ্গে আর তাল রেখে পারিবারিক জীবন টিকে থাকতে পারছে না। তাই পরিবর্তনের ধাক্কায় শুধুই যে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে তাই নয়, সেই সঙ্গে পারিবারিক জীবনও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে ভয়ানক

ভাবে, সংসার-জীবনের চিরপ্রচলিত সংস্কার কিংবা মূল্যবোধগুলো মূল্যহীন হয়ে পড়ছে ক্রমশ। এবং এমনিতর আরও অনেক কথা।

মানি, কিন্তু আজকের দিনের সাহিত্যিকদের সে-সঙ্গে এ কথাও মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সমৃদ্ধির মহৈশ্বর্য শুধু চোখকে ধাঁধায়, দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ; অভাব—যখন প্রচণ্ড অভাবের কারণটার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি পড়ে তখনই। আজ যদি সব দিক থেকেই আমরা দরিদ্র হয়ে পড়ে থাকি তবে আরও পূর্ণদৃষ্টিতে আমাদের তাকাতে হবে ভেতরের দিকে। সাহিত্যকারেরা কি সত্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন না, এখনও বাংলাদেশের কত মেয়ে বাইরের এই ঝঞ্ঝাবাত্যা থেকে সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন অবিরত, এমন কি তার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার সাহস নিয়ে বাইরেও বেরিয়ে আসছেন তাঁরা দলে দলে। বাংলাদেশের নারীর এ আর একটি নতুনতর মহিমময় রূপ। এখানে সে মাও বটে, প্রিয়াও বটে, এবং দুয়ের অতীত নতুন দিনের চিত্রাঙ্গদাও।

ঋষিপ্রতিম কবিকে আহ্বান করি নারীর মহিমাকে নতুন ভাবে উদ্‌ঘাটিত করে বাংলাসাহিত্যের গতি পরিবর্তন করার দায়িত্ব নেবার অধিকার আছে যাঁর।

অনুবাদ সাহিত্যের দায়িত্ব

বিশেষ কোন দেশের সাহিত্যকে কোন এক ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে বোধ হয় তুলনা করা যায়। একাগ্রমন মানুষ স্বকীয় পরিপুষ্টির সাধনায় যদি নিজেকে ব্যাপৃত রাখে তাহলে একদিকে যেমন সে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ সাফল্যটুকুকেই শুধু লাভ করতে পারে, তেমনি তার সীমা-উত্তীর্ণ যে বৃহত্তর জীবন তা থেকে অবধারিতভাবে সে বঞ্চিত হতে বাধ্য। সাহিত্যের পরিবৃদ্ধিও ঠিক এই রকম। আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্য-আবর্তনের মধ্যে হয়তো রসরূপের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে গণ্ডীগত সাহিত্য-পরিধিকে অতিক্রম করেও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিকাশ চলেচে প্রত্যক্ষভাবে সে পরিচয় রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। মনের সমৃদ্ধির জন্যেই ঠিক তেমনি প্রয়োজন আছে সমৃদ্ধতর এবং বৃহত্তর সাহিত্যের সুখস্পর্শের, তা না হলে আপন পরিধির মধ্যে অন্ধের মত আবর্তন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। বাইরের দিকে তাকাতে চাই না, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে একথা সত্য কি না। চর্যাপদ যখন রচিত হয় তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের ধারা স্পষ্ট তিনটি স্তরকে পার হয়ে এগিয়ে এসেছে। প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ, দোহা ইত্যাদির রচনাকাল), মধ্যযুগ (মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য আর চরিতমালা ইত্যাদির রচনাকাল), এবং আধুনিক যুগ (উনবিশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু)। প্রাচীন যুগের কথা বাদ দেওয়া যাক, কারণ সে-সাহিত্য তখনও তার আতুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের

আলো-বাতাসের স্পর্শ লাভ করেনি। কিন্তু মধ্যযুগের যে সাহিত্য অনেকখানি সুগঠিত রূপ নিয়ে লোকচক্ষুর সামনে আত্মপ্রকাশ করলো, শতাধিক বর্ষব্যাপী সাহিত্যরস-পিপাসুর মনোরঞ্জন করে গেলো, আজ যদি বিচার করতে বসি, তাহলে তাকে কি আধুনিক যুগের তুলনায় বেশী কিছু সৌন্দর্য ও শ্রীসম্পন্ন বলে স্বীকার করতে পারবো? অবশ্য এ কথা সত্য যে তুলাদণ্ডের মান নিয়ে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যই সমৃদ্ধির গৌরব অনিবার্যরূপে অর্জন করবে। তাছাড়া, স্ফীতোদর রচনা সে-যুগের সাহিত্যে যেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে আগে বা পরে কখনো তা পারে নি। আমাদের ভরসা এই, তুলাদণ্ডের মানই সাহিত্যের মান নয়, আর রচনার স্ফীতিটাই তার ঔৎকর্ষের একমাত্র প্রমাণ বলে কোনো দিন স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু ইতিহাসের সংবাদ যার কাছে অগোচর নয়, তিনি জানেন, মধ্যযুগে সাহিত্যের পক্ষে এমনতর কাণ্ড ঘটাবার কারণ যা ছিলো তা আর যা-ই হোক সাহিত্যিক নয়। এ-কথাটা অবিসংবাদিত রূপে সত্য যে, রচনাকার্যের পেছনে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণাটাই মুখ্য ব্যাপার ছিলো না, আসল বস্তু যা ছিলো তা হলো দেব বা দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণনারই অদম্য উৎসাহ। আজ এ-ঘটনাটাকে যত হাস্যকরই মনে হোক সেদিন ওটাই ছিলো একান্ত সিরিয়াস ব্যাপার। ইনি যদি চণ্ডীর গুণ গাইলেন তো পাল্টা জবাবে উনি গাইলেন মনসার গুণগান। তুমি শিবভক্ত আর আমি কালীভক্ত—তা হলে, প্রমাণিত হোক কে বড়, শিব না কালী। ব্যস, স্ফীতকায় মহাকাব্য রচনা শুরু হয়ে গেলো।

কাব্যের আকৃতি ছোট হলে তো চলবে না, কারণ আমার দেবতার গুণ গান করলেই চলবে না, প্রমাণ করতে হবে তো তোমার দেবতা ছোট। বাংলাসাহিত্যে সমগ্র মঙ্গলকাব্যের যুগটা এই দ্বন্দ্বের যুগ। শুধু তাই নয়, দল-বেধে মারামারি করার মতই এ সাহিত্যদ্বন্দ্বের রূপ। কানাহরি মনসামঙ্গলের-পত্তন করলেন, আর তার চরণ ছুঁয়ে

আসরে নামলেন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, ক্ষেমানন্দ এবং আরো অনেকে। ময়ূরভট্ট যদি হাত দিলেন ধর্মমঙ্গলে তো অনুকারীর অভাব ঘটলো না তাঁর। মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি—তার অর্থ এই নয় যে তিনি একাই এই কাব্যের রচয়িতা। এই অর্থে তিনি শ্রেষ্ঠ যে আর যারা চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন, তাঁরা তাঁর মতো খ্যাতি অর্জন করে যেতে পারেন নি।

নির্লজ্জের মতো একাধিক কবি যে নানা ঢঙে একই আখ্যান-বস্তুকে নিয়ে এমনভাবে কণ্ডুয়ন করে গেছেন তার কারণ কি? শুধু যে কাহিনীটুকুই এক তাই নয়, প্রায় সকলের কল্পনার ধারাটা পর্যন্ত প্রায় একই পথানুসারী। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করে কত কবি যে কাব্য গাথা রচনা করে গেছেন, তার হিসাব নেওয়া আজও শেষ হলো না। চরিতমালা রচনায়ও সেই একই পদ্ধতি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ থেকে আরম্ভ করে লোচনদাস জয়ানন্দ আর বৃন্দাবন দাস একই নায়কের জীবনগাথা আবৃত্তি করলেন বারবার। অথচ মজা এই দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ কোথাও নেই। স্পষ্টই বোঝা যায়, সাহিত্যসৃষ্টির প্রায়াসটাই এখানে বড় কথা নয়, আসল কথা হলো আপন আপন গুরুদের বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির স্তবগান করা। মঙ্গলকাব্যের রচয়িতারা যে গুণাবলী আরোপিত করেছেন দেবদেবীর মধ্যে চরিতমালার রচয়িতারা তাই এনে জড়ো করেছেন এইসব গুরুদেবের জীবনী বর্ণনায়। একদল করেছেন দেবতাকে বড়, আর একদল মানুষকে—প্রকৃতির দিক থেকে যতই কেন না বৈসাদৃশ্য থাকুক আসলে উভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা প্রায় একই। এরই মধ্যে আশ্চর্য বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় বৈষ্ণব কবিতাগুচ্ছের মধ্যে। খাঁটি গীতি-কাব্যের ভিতর দিয়ে সত্যিকারের হৃদয়ানুভূতি যেন প্রকাশিত হয়েছে এখানে। কিন্তু অবশেষে এক সময় এই বৈচিত্র্যও তো আবর্তিত হলো একই গতানুগতিকতার মধ্যে। সংক্ষেপে আলোচনা

করলাম প্রায় সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য। দেখা গেলো, বিস্তৃতি থাকলেও বৈচিত্র্য নেই, একই সীমার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে বেরিয়েছে এ-যুগের সাহিত্য। কিন্তু তার কারণ কি? বাংলা-সাহিত্যের যে তৃতীয় স্তরের উল্লেখ আমি করেছি, তাকে যদি আলোচনা করা যায় তাহলে অত্যন্ত সহজেই বোঝা যাবে মধ্যযুগীয় সাহিত্য এমন নিঃস্ব হয়ে ছিলো কিসের অভাবে। ভারতচন্দ্রের পর এক শতাব্দীর ব্যবধান পার হয়ে বাংলা-সাহিত্য যখন পরিপূর্ণ ভাবে এক নতুন রূপ নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করলো, তখন দেখা গেলো, তার সঙ্গে কোন মিল নেই পূর্বতন সাহিত্য ধারার, এ-যেন এক নতুন ব্যাপার।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক পরিবর্তনটা লক্ষ্য করতে হবে। তা না হলে নতুন এই সাহিত্য ধারার সূচনাকে বোঝা কিছুতেই সম্ভব হবে না। সাগরপারের রাজা তাঁর রাজত্ব প্রসারিত করেছেন সমগ্র ভারতবর্ষে, সুতরাং বাংলায়ও। ফলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রযন্ত্রেরই আমদানী হলো না; সঙ্গে এলো সাগর পারের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি আর সাহিত্য—যে সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছে সমগ্র পৃথিবীতে। সেদিন যে নবীন যুবকের দল বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্যবহারিক জীবনে উন্নতি লাভের প্রচেষ্টায় অগ্রসর হলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ সে-সাহিত্যের সন্ধান পেয়ে বিমুগ্ধ হলেন, আকণ্ঠ পান করলেন সে সাহিত্যসুধা। এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাঁদের-নিজের দেশের যে ঐতিহ্য তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, বৃহত্তর মহত্তর সাহিত্যের সন্ধান তাঁরা পেয়ে গেছেন। অতএব নতুন করে যাঁরা তখন বাংলাসাহিত্য সৃষ্টির কাজে হাত দিলেন, অবধারিত ভাবে ইংরাজী সাহিত্যের ভাবনাধারণা ও ধরণধারণ তাঁদের কলমের মুখে প্রকাশিত হলো। তাই সেদিন বিচারসমিতি বসলো এই প্রমাণ করবার জন্য, মেঘনাদ বধের মধ্যে বাংলাদেশের দান

বেশী না য়ুরোপের দান বেশী, দুর্গেশনন্দিনী বাংলা-ভাষার ছদ্মবেশে আইভানহো কেই এনে হাজির করেছে কিনা। ভ্রূকুটি-কুটিল সমালোচনার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে মধুসূদন, হেম-নবীন বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র নিরুদ্বেগে ইংরাজী-সাহিত্যের ভাবনাধারাকে আয়ত্ত করে নিয়ে তাকে নূতন করে ঢেলে সাজালেন বাংলাদেশের মাটিতে। এবং দেখা গেল যে সীমিত বদ্ধজলার মধ্যে শতাব্দীব্যাপী মধ্যযুগীয় সাহিত্য শুধু আবর্তিত হয়েছে তাই বিচিত্রতায়, প্রসারতায়, সমুদ্রের মুক্তির সন্ধান পেয়েছে এখন। পুরাতন কাহিনীকে অবলম্বন করে এঁরাও কাব্য রচনা করলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে তো পুরাতন রচনারীতির পুনারাবৃত্তি ঘটলো না, বরং বাংলাসাহিত্য অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যেই আশ্চর্যরকমভাবে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠলো। তা ছাড়া, এ-সমৃদ্ধির মূলে আরও একটি কারণ ছিলো যে কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা দেখেছি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো মহিমাপ্রচার, কিন্তু বিদেশী সাহিত্যের স্পর্শ পেয়ে আধুনিক সাহিত্য প্রচার করতে চেষ্টা করলো সাহিত্যেরই মাহাত্ম্য, দেবদেবতা বা গুরু মাহাত্ম্য নয়। গ্রহণ ও প্রকাশের এই উদারতা ও প্রসারতার জন্যই আধুনিক কালের সাহিত্য সর্বদিক দিয়েই তার পেছনের ইতিহাসকে অবজ্ঞাত করে রাখলো।

সামগ্রিকভাবে বাংলাসাহিত্যের পরিচয় এই। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র থেকে আজকের সাহিত্যিক পর্যন্ত এই ধারারই ধারক, বাহক। বিদেশী সাহিত্যকে অগ্রাহ্য করে আর স্বয়ং-সম্পূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি যে সম্ভব নয় তা প্রমাণিত হয়েছে—তাতে মুক্তি নেই, আছে জরতাই; তা সাহিত্য নয়, আপন মনের সঙ্কীর্ণতারই পরিচয়। কিন্তু প্রভাবটাকে শুধু গ্রাহ্য বলে মেনে নিলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে পরিমিতি বোধটাও একান্ত প্রয়োজন—যার অভাবে সৎ হওয়ার পরিবর্তে অসৎ সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ারই আশঙ্কা বেশী। আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্যের রচয়িতারা

তাও প্রমাণ করেছেন। এবং এমন বিসদৃশভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবকে স্বীকার করে নেওয়ার অতিশয় উৎসাহে তাঁরা কখনও-কখনও সোজাসুজি বিদেশের সাহিত্যকেই যেন বাংলা ভাষার আবরণে পাঠক সাধারণের কাছে এনে দাঁড় করিয়েছেন। তার ফলে সে রচনার সঙ্গে বাঙালী জীবন বা সমাজের কোন যোগাযোগের লক্ষণই প্রকাশ হতে পারেনি। তাই উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয় তা হলে তাঁকে একদিকে যেমন হতে হবে পরিপূর্ণ ভাবে স্বদেশী, তেমনি অন্যদিকে হতে হবে ততখানিই গ্রহণ-বর্জন ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানী। এই পরিমিতি বোধ যদি না থাকে, তা হলে অনেকখানি ক্ষমতা নিয়েও লেখককে যে অবধারিত ভাবে ব্যর্থ হতে হবে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

বিশেষ কোন দেশের সাহিত্যের ওপর অপর দেশের উন্নততর সাহিত্যের প্রভাবকে অকুণ্ঠায় গ্রহণ করা যদি সঙ্গত বলে স্বীকৃত হয়, তা হলে পাঠক সম্প্রদায়ের মুখ চেয়ে সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের আরও একটি অবশ্যকরণীয় কর্তব্য পালন করার প্রয়োজন আছে। যে-কোনো দেশেরই হোক, মহৎ সাহিত্য বলে মানতে যদি বাধা না থাকে তবে সে সাহিত্যের নির্ভেজাল আস্বাদ যাতে পাঠকেরা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করাও দরকার। তাতে দুদিক দিয়ে উপকার হয়। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের দিক থেকেই এ-সমস্যাটাকে দেখা যাক। নতুন রূপ নিয়ে যেদিন থেকে আধুনিক বাংলাসাহিত্য তার যাত্রা শুরু করেছিলো, সেদিন থেকেই সে অকুতদ্বিধায় ইংরাজী সাহিত্যের ঐশ্বর্যকে স্বীকার করে নিয়েছিলো। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে বাঙ্গালী পাঠক শুধু সাধারণভাবে অনুভব করতে পেরেছিলো তার আপন সাহিত্যের মধ্যে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবকে কিন্তু সোজাসুজি সে সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি। কিন্তু যে দিন এ পরিচয়ের ঐকান্তিক প্রয়োজন ঘনিষ্ঠভাবে অনুভূত হলো, সেদিন সাহিত্যিকরা এ প্রয়োজন মেটাবার

দায়িত্বও গ্রহণ করলেন। ইংরাজী সাহিত্য সোজাসুজি প্রচারিত হতে শুরু করলো বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে। সাধারণ শিক্ষিত পাঠকদের কাছে বিদেশী সাহিত্যকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হলো অনুবাদের মধ্য দিয়ে। তাতে একদিকে যেমন বিদেশী সাহিত্য তার স্বকীয়তা নিয়েই প্রচারিত হতে লাগল বাঙ্গালী পাঠকের ঘরে-ঘরে তেমনি আপন মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন ভাষার সঙ্গে পরিচয় নেই যাঁদের তাঁরা বিনা আয়াসেই হাতের কাছে পেলেন দেশান্তরের সাহিত্যকে তার নিজস্বরূপে।

সাধারণ বা অল্পশিক্ষিত পাঠকদের কাছে বিদেশী সাহিত্যের রূপরসকে যাঁরা পৌঁছিয়ে দেবার ভার নেন, নিছক অনুবাদ কার্যের ভেতরেই যে তাঁদের সমস্ত কর্তব্য শেষ হয় না, তা বলাই বাহুল্য। তা যদি হতো, তা হলে স্কুলপাঠ্য পুস্তকের অর্থবইকেও স্বচ্ছন্দে অনুবাদ-সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করা চলতো। এ কথা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, অনুবাদকের কৃতিত্ব কেবলমাত্র তর্জমা করে যাওয়ার কায়িক শ্রমের মধ্যেই নিহিত নয়। যে কারণে সাধারণ তর্জমাও সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত হয় তা একান্তভাবে নির্ভর করে অনুবাদকের সাহিত্য সৃষ্টি করার ক্ষমতার ওপর। অনুবাদককে মনে রাখতে হবে তিনি যে কাজে হাত দিয়েছেন তা মৌলিক কিছু না হলেও, সাহিত্যকর্মই। সুতরাং তাঁর রচনার মধ্যে সাহিত্যের সমস্ত প্রকার গুণকেই বজায় রাখতে হবে। কোনো রচনা মহৎ এবং উন্নত বলে পরিগণিত হয় তখনই, যখন তার মধ্যে সত্যিকারের সাহিত্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়—শুধুমাত্র ভাষা বা আঙ্গিক কিংবা কথাকাহিনীটুকুই সাহিত্য নয়। অনুবাদক এই সাহিত্য-বস্তুকেই রূপান্তরিত করবেন তাঁর নিজের ভাষায়। আপন দক্ষতায় যেমন দেবেন তিনি ভাষার সৌন্দর্য ঠিক তেমনিভাবেই তাঁকে প্রকাশ করতে হবে অনুবাদ্য রচনার রূপ ও রসকে। তা যদি না হয়, তা হলে শুধু যে তাঁর রচনা ব্যর্থ হবে তাই নয়,

অগণিত পাঠকের কাছে তিনি মিথ্যাচারের অপরাধে অপরাধী হবেন। এ দায়িত্বকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে যদি অনুবাদকের আপত্তি না থাকে, তা হলে এ প্রতিজ্ঞা অবশ্যই তাঁকে ঘোষণা করতে হবে যে তিনি কোনোভাবে কোনোখানেই ফাঁকি দেবেন না। আগেই বলেছি, অনুবাদ মানেই তর্জমা নয়, কোনো মহৎ সাহিত্যের ভাষান্তরের সাহিত্যিক রূপায়ণকেই অনুবাদ বলতে হবে— এবং অনুবাদের পাঠক তাঁরাই যাঁরা মূল ভাষার সঙ্গে পরিচিত নন। সুতরাং যদি কোন রচনাকে ভাষান্তরিত করবার প্রয়োজন হয় তবে তা করতে হবে পরিপূর্ণভাবে, অনুবাদকের ইচ্ছানুযায়ী মূলরচনার বক্তব্যকে বাদ দেওয়া কিছুতেই চল্‌তে পারবে না। তাই যদি হয় তা হলে অনুবাদের সার্থকতা আর রইলো কোথায়। আপাতভাবে এ-কাজটাকে যত সহজই মনে হোক, তার দায়িত্বকে যদি লেখক আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে সম্মত হন, তা হলে দেখা যাবে যে কোনো মৌলিক রচনার চাইতে এ-কাজের দুরূহতা কিছু কম নয়। মৌলিক ও অনূদিত রচনার মধ্যে যে পার্থক্য তা মানসিক পরিশ্রমের প্রকৃতিভেদ মাত্র। মৌলিক রচনাকে স্রষ্টা বলে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাবো, কিন্তু সার্থক অনুবাদককে রূপকারের সম্মান থেকে বঞ্চিত করবো কেন?

সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্যের প্রসার ঘটেছে আশ্চর্যরকমভাবে, এবং তা এত দ্রুতগতিতে যে সাধারণ শিক্ষিত পাঠক-সমাজের পক্ষে উল্লসিত না হয়ে উঠবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। এর কারণ নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রত্যক্ষভাবে এ-যুদ্ধে ভারতবর্ষ যোগ না দিলেও সমগ্র পৃথিবীতে যে প্রলয়ঙ্কর আলোড়ন সংঘটিত হয়ে গেলো, তা থেকে চোখ বুজে সরে থাকার উপায় যেমন কোনো দেশের পক্ষেই সম্ভব ছিলো না, তেমনি ভারতবর্ষকেও নানাভাবে এ যুদ্ধকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিলো। তার ফলে অবধারিতভাবে এক আন্ত-র্জাতিক সংমিশ্রণ দেখা দিলো—বিভিন্ন দেশের মতবাদ এলো ভারতবর্ষে,

এলো তাদের ভাবনা ধারণা আর এলো সংস্কৃতির মূলাধার সাহিত্য ও শিল্প। একদিন যেমন বাংলাদেশের বিদগ্ধ সমাজ পরম নিষ্ঠার সঙ্গেই ইংরাজী সভ্যতা ও সাহিত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছিল, আজও তেমনি উদারতা আর নিষ্ঠার সঙ্গেই এই নবচেতনাকে সে গ্রহণ করতে এগিয়ে এলো। শুধু সভ্যতার অনুশীলন-স্পৃহা নয়, শুধু সাহিত্য-জিজ্ঞাসাও নয়, এবার বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় প্রাণ আকুল হয়ে মুক্তির পথ খুঁজেছে দিকে দিগন্তরে। রাজনৈতিক প্রয়োজনে দেশান্তরের মতবাদ এসেছে ভারতবর্ষে, সঙ্গে এনেছে তার সাহিত্যকেও। কিন্তু এখানে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সহজেই লক্ষ্য করা যাবে। ইংরাজি সভ্যতাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের রচনার মধ্যে তার প্রভাবটাই ছিলো একান্তভাবে, তাঁরা স্পষ্টাক্ষরে ইংরাজি সাহিত্যকে ভাষান্তরিত করতে চেষ্টা করেন নি। কিন্তু এবার যে বিদেশী সাহিত্যের প্লাবন এলো ভারতবর্ষে তা কোনো সুস্থ প্রভাব রেখে যাচ্ছে বলে কিছুতেই স্বীকার করা যাবে না। দেশান্তরের সাহিত্য ভাষান্তরিত হয়ে তাদের স্বকীয় রূপকেই শুধু প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষে আজ যে সামাজিক বিপ্লব শুরু হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি এই ঘটনার কোনো অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহলে সম্প্রতি-কালের অনুবাদ-সাহিত্যের সত্যিকারের প্রকৃতিটিকে বোধ হয় খুব সহজেই বুঝতে পারা যাবে। বাংলার ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে রেনেসাঁ এসেছিলো, তার উদ্গাতারা চেয়েছিলেন বাঙ্গালীর ভাবরাজ্যে বিপ্লব আনতে, তাই তাঁদের রচনার মধ্যে পাশ্চাত্যের মননশীলতা ছিলো, তার সামাজ-রূপের প্রতিচ্ছবি ছিলো না। কিন্তু আজ যে বিপ্লবের ইঙ্গিত দিচ্ছেন দেশের নায়কগণ ভাবনাধারণার বিবর্তনটা তাঁদের কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তাঁদের আসল লক্ষ্য হলো সমাজ-মানসের পরিবর্তন সাধন করা। তাই বিদেশের চিন্তাধারাকে সাধারণ জনগণের সামনে তুলে না ধরে

বিদেশের খাঁটি রূপটিকে তাঁরা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন প্রাণপণ— যাতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের অবস্থাকে ভালো করে জান্‌তে পারে এ-দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সমাজ। এ প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে হলে বিদেশী সাহিত্যের অনূদিত সংস্করণ প্রকাশ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। আজ যে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ ক্রিয়ার ছড়াছড়ি, আমার মনে হয় তার একমাত্র না হোক অন্যতম কারণ এটা।

সুতরাং, অনুবাদ শাখা দিন দিন স্ফীতকায় হয়ে উঠলেও, তা বাংলাসাহিত্যকে সত্য সত্যই সমৃদ্ধ করে তুল্‌তে পারছে, এ-কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। রাজনৈতিক মতবিরোধ যখন পেছনে কাজ করে চলেছে, তখন সাহিত্যকর্মও উদ্দেশ্যমূলক না হয়ে পারে না। মতবাদের বিশ্বাসটাই যেখানে কর্তা, সাহিত্যিক রুচিবোধ সেখানে তার কর্তৃত্ব হারাতে বাধ্য। তার অর্থ, সুসাহিত্যকে ভাষান্তরিত করার প্রয়োজন আজ অস্বীকৃত; অনুবাদকের স্বকীয় মতবাদবহ কুসাহিত্যেরও ভাষান্তর-গ্রহণ তাই আজ সাহিত্যপ্রয়াস বলে বিবেচিত হয়ে চলেছে। তার ফলে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, যে-কোন লেখকের রচনা নির্বিবাদে বাংলাভাষায় অনূদিত হয়ে চলেছে—রুচির প্রশ্ন নেই, সার্থকতার আশ্বাসও নেই, অনুবাদ-সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য তো ব্যাহত হয়েছেই। সাহিত্য হিসেবে নয়, বিদেশী রচনা আজ প্রোপাগাণ্ডার যন্ত্র হিসেবেই শুধু ব্যবহৃত হচ্ছে, এ-কথা দুঃখের সঙ্গে হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই।

শুধু তাই বা কেন, যে-কোনো দেশের সাহিত্যের পক্ষেই যা মর্মান্তিক লজ্জার বিষয় বাংলাদেশের এই আত্মঘাতী অনুবাদপ্রীতি তাকেও অবলীলায় প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে। সৃষ্টির ক্ষমতা থেকে যারা বঞ্চিত, অথচ যারা সাহিত্যিক যশঃপ্রার্থী এখানেই তাঁরা তাঁদের পথ খুঁজে পেলেন। মূল গ্রন্থের মহত্ত্ব বা বৈশিষ্ট্য কি তা জানবার প্রয়োজন নেই, বাংলা ভাষার বাইরে যা-হোক একটা কিছু হলেই

হলো। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাকেই তাঁরা বাংলা ভাষায় রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির কোনো ক্ষমতাই যাঁদের নেই তাঁদের রচনা শুধু ভাষার জড়তায়, ভাবপ্রকাশের অক্ষমতায় তর্জমার রূপ নিয়েই প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সার্থক অনুবাদ সাহিত্য আর হয়ে ওঠার অবকাশ পাচ্ছে না। অনুবাদ সাহিত্যের এই ব্যর্থতা আজ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পক্ষে গ্লানিকর বলে মনে হলেও ভরসা এই, আজকের দিনের যত কিছু আবর্জনা কালের বিচারে একদিন তার মলিনতা প্রমাণিত হবেই।

কিন্তু এ-প্রবাহ যে বাংলাসাহিত্যকে কিছুমাত্র সমৃদ্ধতর করে তোলে নি, তাই বা বল্‌বো কেমন করে। এমন অনেক গ্রন্থ তো আমাদের হাতে এসেছে যারা আধুনিক হয়েও রূপে-রসে-প্রকাশে যেমন মূল-রচনার পরিচয়কে অস্বীকার করেনি, তেমনি বাংলাভাষার সৌন্দর্য থেকেও বঞ্চিত হয়নি। এমনটা হতে পেরেছে অনুবাদকের আন্তরিকতার গুণেই। এ-আন্তরিকতা যদি থাকে, লেখক যদি অনুবাদ-কর্মকে সাহিত্যসৃষ্টির সমমর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত না হন তা হলে তাঁর রচনা সার্থক না হয়েই পারে না। আন্তর্জাতিক প্রভাবকে অস্বীকার করা যখন আজ আর সম্ভব নয়, তখন দেশের সুসাহিত্যিকদের কাছে আমাদের বিনিত প্রার্থনা, তাঁরা এ-পথেও তাঁদের আন্তরিকতা এবং সৃষ্টিক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে আসুন, সমৃদ্ধতর উন্নততর ঐশ্বর্যবান করে তুলুন বাংলা সাহিত্যকে। তাঁদের সে শুভ সৃজনপ্রয়াস 'নিঃসন্দেহে অভিনন্দন কুড়োবে সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছ থেকে, অক্ষম যশঃপ্রার্থীর দল আর আবর্জনা সৃষ্টি করবে না। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতেই বাধ্য হবে।

সাহিত্য সমালোচনা

সাহিত্যকে উদ্দেশ্য করেই সাহিত্য-সমালোচনা, কিন্তু সমালোচককে অগ্রাহ্য করা সাহিত্যিকের পক্ষে অসম্ভব। Art For art's sake-এর ধুয়া ধরে যদি কোন সাহিত্যকার উচ্ছল প্রাণাবেগকে মনের আনন্দে প্রকাশ করতে চান, তা'হলে হয়তো তিনি পারেন সমালোচনার প্রতি চোখ বুজে থাকতে, কিন্তু তাঁর রচনার যথার্থ মূল্য বিচার করবার যখন সময় আসবে, তখন আর তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না অপত্যস্নেহে আপনার রচনাকে পক্ষচ্ছায়ে ঢেকে রাখা। সে প্রয়াস সাহিত্যিকের নিজের পক্ষেই শুধু ভ্রমাত্মক নয়, সাহিত্য ধারার ইতিহাস রক্ষার পক্ষেও সে প্রয়াস অকল্যাণকর। তবে ভারসা এই, যথার্থ সমালোচক কখনও সাহিত্যিকের মুখের দিকে তাকিয়ে সাহিত্য বিচার করতে পারেন না, কারণ, তিনি জানেন, আলোচ্য রচনার মূল্য তার স্রষ্টার ব্যক্তিগত মতামতের অপেক্ষা রাখে না। যে মুহূর্তে সে একটি পরিপূর্ণ সাহিত্য-রূপ নিয়ে সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে প্রকাশিত হয় ঠিক সেই মুহূর্তেই তার ওপর থেকে রচনাকারের অধিকার অনেকখানিই কমে যায়। শুধু তা-ই নয় তখন সে-সাহিত্য বিশেষ করে পাঠক সাধারণের; সুতরাং পাঠক এবং সমালোচক হিসেবে তাঁরও অধিকার তার ওপর কিছু কম নয়।

বোধ হয় এইজন্যই সমালোচকের প্রতি প্রত্যেকটি সাহিত্যিকের হৃদয়েই এমন একটি দুর্বল অনুভূতি আপনা থেকেই জন্মলাভ করে যাকে অস্বীকার করবার উপায় তাঁর নেই। আপাতভাবে তাকে ভয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আত্মস্থ হয়ে বুঝতে গেলে দেখা যায় ত

ভয় নয় স্বাভাবিক ঔৎসুক্য মাত্র। এ ঔৎসুক্যকে তথা হৃদয়ের এ দুর্বলতাকে জয় করতে পারেন তাঁরাই, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হোন বা না হোন, অন্তত আত্মবিশ্বাস যাঁদের প্রবল। আত্মবিশ্বাস বলছি এই জন্যই যে, এই প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠার যোগাযোগ বস্তুত ঘনিষ্ঠ নয়। কারণ, আত্মপ্রত্যয়-প্রসূত যে-সাহিত্য, সমসাময়িক কালের বিচারে তার মূল্য যা-ই নিরূপিত হোক না, ভবিষ্যদিনের বিচার হয়তো তাকে অস্বীকার করতে পারবে না, আর সাময়িক প্রতিষ্ঠা প্রায়ই ক্ষণকাল-স্থায়ী। জনমন উদ্বুদ্ধ-করা সাহিত্যও অনেক সময় তার স্রষ্টাকে সাময়িক কালে প্রতিষ্ঠাবান করে তোলে, সত্যিকারের সাহিত্য হিসেবে যার মূল্য হয়তো যৎকিঞ্চিৎ কিংবা কিছুই নয়। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে সমালোচনার বিচারে সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সাধারণভাবে এ-হিসাবটাকেই যেন বিশেষভাবে সত্য বলে মনে হয়।

তা'হলে কথাটার অর্থ দাঁড়ায় এই রকম, যে সাহিত্যিকের আত্মপ্রত্যয় যত বেশী, সে সাহিত্যিকই তত বেশী সাহসের সঙ্গে সমালোচকের মুখের সামনে দাঁড়াতে পারেন। সাধারণভাবে এ উক্তির অর্থবোধ করা কঠিন না হলেও মর্মভেদ করা যে সহজ নয় তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, আত্মপ্রত্যয় আর আত্মাভিমান এক জিনিস নয়। প্রত্যয় মানুষকে উদার করে, দৃষ্টির প্রসারতা বাড়ায় কিন্তু অভিমান করে নীড়াশ্রয়ী, অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিকতাই আত্মাভিমানী সাহিত্যিকের একমাত্র অবলম্বন।

আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্যিককে তাই অনেক সময় দেখা যায়, এমন একটা আবরণের মধ্যে নিজেকে আবৃত করে রাখেন, সাধারণ পাঠক সহসা যাকে তাঁর ব্যক্তিত্ব বলে ভুল করে থাকেন। কিন্তু বিচার করে দেখলে ধরা পড়বে, তাঁর এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের ছলনাটুকু কত গুরুত্বহীন। এই ছলনাকর আবরণটা এক একজন লেখকের এক এক রকম। কেউ-বা তাঁর মনের কথাটা খুব স্পষ্ট করে বলতে সাহস পান

না, তাই রূপকের আশ্রয়ে তাকে প্রকাশ করবার পথ খোঁজেন। কেউ-বা নিজেকে জনসমাজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে অদ্ভুত এক করুণার দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেন তাঁর বাইরেকার জগৎকে ; ফলে তাঁর রচনা থেকে মনে হয়, তাঁর অঙ্গুলিনির্দেশটাই বুঝি একমাত্র সত্য পথ, সাহিত্যের সত্যিকার গতিপথটাকে বুঝি তিনি একাই প্রবাহিত করে চলেছেন। আরও একটা রীতি আছে, আত্মাভিমানী লেখকদের অধিকাংশই যে রীতিটা অনুসরণ করে চলেন। এখানেও লেখকের একটা ব্যক্তিগত দৃষ্টি আছে—কিন্তু তা করুণার নয়, বিদ্রূপে শাণিত, তার গতি তির্যক। এই তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি সমগ্র জগতটাকে দেখেন, দেখেন সমগ্র মানব সমাজকে। সুতরাং একটা বক্র কটাক্ষে অন্যকে বিদ্রূপ করেই এ জাতের লেখক আনন্দ পান। সাধারণ স্যাটায়ার-রচনার দিকে যাঁদের ঝোঁক বেশী, তাঁরাই ব্যঙ্গচ্ছলে নিজেদের মনের কথাটাকে এমন ভাবে মিঠিয়ে মিঠিয়ে লিখতে ভালবাসেন।

এই তিন ধরনের রচনাকারের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে তাদের পাঠকদের দিকেও একটু নজর দেওয়া দরকার। মানুষের মন স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ বক্তিগত জীবনে শুধুমাত্র ভাত কাপড়ের অন্বেষণেই তাদের অধিকাংশের এমন ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে প্রতিদিনের তালিকা পার হয়ে চলে যে বিশেষ ভাবে বাইরের দিকে তাকাতে বা সে সম্বন্ধে কিছু একটা স্বকীয় সিদ্ধান্ত গড়ে তুলতে প্রায়ই আর অবকাশ জোটে না। সমগ্র ভারতবর্ষ সমন্ধে না-হোক অন্তত বাংলাদেশ সম্বন্ধে এ-কথাটা যে মিথ্যা নয়, নিম্নবিত্ত শ্রম-সর্বস্বদের কথা না হয় বাদই দিলাম, কেবল মধ্যবিত্ত সংসারের যে-কেউ নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখলেই আশা করি তা স্বীকার করবেন। আমার তো মনে হয়, শুধু বাংলাদেশকে গালাগালি দিয়ে লাভ নেই, যে কোনো অনুন্নত দেশের পক্ষেই এ-কথাটা খাঁটি সত্য এবং তা যদি মানতে কারো আপত্তি না থাকে, তা হলে বোধ হয় এমন কথা

একরকম জোর করেই বলতে পারি যে এই মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষগুলি এমন সাহিত্যেরই দিকে নিজেদের স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রকাশ করবে যা সমষ্টিগতভাবে হলেও তাদের ব্যক্তিগত মনোবৃত্তিকেই প্রকাশ করতে পারে। যে তিনটি প্রকৃতির কথা আমি উল্লেখ করেছি দেখা যাচ্ছে, যে-কোনো ভাবেই হোক, সাধারণ পাঠকদের সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যেরই প্রচুর মিল ঘটে। সাধারণ পাঠকসমাজ যে অত্যন্ত সহজে দ্বিরুক্তি না করে ব্যঙ্গাত্মক রচনার দিকে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন আমার মনে হয়, তার অন্তর্নিহিত কারণটা এইখানেই লুকিয়ে আছে। এবং এই জন্যেই আত্মকেন্দ্রিক লেখক নিজেদের রচনার সাফল্য দেখে পুলকিত হয়ে উঠতে পারেন সহজেই।

ইংরাজিতে একটি কথা আছে Style is the man, আর এখানে যে শ্রেণীর লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো, রচনার অন্তরটা যতক্ষণ না বিশদভাবে বিচার করা যায় ততক্ষণ তাদের রচনাভঙ্গি ও রচনা কৌশলকে এই style-এরই একটা নিজস্ব প্রতীক বলা যেতে পারে। কিন্তু এখানেও বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে, যে অর্থে style is the man বলা হয়ে থাকে, এটা সে অর্থে সত্যিই style নয়। যদি তাই হতো তা হলে অন্তত রচনার অন্তর্নির্যাস থেকে সত্যিকার man-কে আবিষ্কার করা কষ্টকর হতো না। কিন্তু আগেই বলেছি, যাঁরা আত্মকেন্দ্রিক লেখক তাঁরা বাঁচোয়া হিসেবে অবধারিত ভাবে একটা আবরণের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, সাধারণের কাছে এই আবরণটাকেই style বলে মনে হতে পারে। বস্তুত, এ কথাটা কিছুতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এরা মহৎ কিছু তৈরি করতে পারুন বা না-ই পারুন এটা অন্তত পারেন যাতে নির্ঝঞ্ঝাট পাঠকগোষ্ঠী কোনো প্রকার দ্বিধাবোধ না করেই তাঁদের রচনাকে অন্তরঙ্গ বলে গ্রহণ করতে পারেন। এই কীর্তিটাই তাঁদের একমাত্র গুণ, এবং যতদিন তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য বেঁচে থাকে (ভরসা এই, লেখকদের জীবিত

কাল পর্যন্তই সাধারণত এই সাহিত্য বেঁচে থাকতে পারে ; এমন কি, অনেক লেখক তাঁদের জীবন কালেই নিজের সাহিত্যের অনিবার্য মৃত্যুকে চোখের সামনেই দেখে যাওয়ার দুর্ভাগ্য ভোগ করে যান) ততদিন এই কীর্তিটারই জয়জয়কার। আর একটু খুলে বললে বলতে হয়, এই সব সাহিত্যিক নিজেদের বক্তব্যকে প্রকাশ করবার জন্য প্রয়োজন মত উপযুক্ত রচনারীতির একটা গঠন তৈরি করে নেন। অভ্যাসে সব কিছুই একটা পরিণত রূপ লাভ করে, সুতরাং তাঁরাও যে তাঁদের রচনাকৌশলকে শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে আয়ত্ত করতে পারবেন তাতে আর বিচিত্র কি। এটা প্রচলিত অর্থে style বলে বিবেচিত হলেও তা থেকে যে man-এর প্রকাশ ঘটে তা সত্যিকার মানুষের প্রতিরূপ নয়, অপ্রভ্রংশ মাত্র। অপভ্রংশ হতে বাধ্য কারণ সমগ্র মানুষকে গড়ে তুলতে যে সামগ্রিক দৃষ্টির প্রয়োজন, সে-দৃষ্টি তাঁদের নেই—তাঁদের দৃষ্টি খণ্ডিত, শুধু খণ্ডিত নয়, তির্যকও। সুতরাং তাঁদের রচনার মধ্যে যদি সত্যিকার মানব সমাজের প্রতিরূপ দেখতে না পাওয়া যায়, তাহলে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। সব মিলিয়ে কথাটা শেষ পর্যন্ত এ-ভাবে বলা যেতে পারে যে, রচনা কৌশলের দিক থেকে যতই কেননা জৌলুষ থাক, সে জৌলুষের আবরণ ভেদ করে যদি একটি অখণ্ড রূপ প্রতিভাত না হয়, তা হলে সে লেখক কিছুতেই নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে সমর্থ হন না। অবশ্য এ কথাটাও সত্য যে নিজেকে প্রকাশ করা তাঁদের রচনার আসল উদ্দেশ্য নয়, তাঁরা আত্মগত—ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

কিন্তু ইংরাজি উক্তিটি মিথ্যা নয় এবং আক্ষরিক ভাবে সত্য। যাদের সম্বন্ধে এ বাক্যটিকে সত্য বলে গ্রহণ করা চলে, পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যের পক্ষে তা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের বিষয় কি না বলতে পারি না, তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তা'হলেও বিচার করে দেখা দরকার তাঁরা কোন শ্রেণীর সাহিত্যিক যাঁদের রচনাশৈলীর প্রতিটি

অক্ষর ভেদ করে স্বকীয়তা কিংবা সহজ করে যাকে বলা যায় ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ এই man নিজস্ব প্রতিভায় উজ্জ্বল হয়ে পাঠকের হৃদয়ের কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আমি অন্তত পৃথিবীর যত মহৎ সাহিত্য পড়ে দেখবার সুযোগ লাভ করেছি, তাতে স্পষ্টভাবে এই কথাটা একান্ত সত্য বলে বুঝতে পেরেছি যে সেখানে সাহিত্যকাররা কখনো নিজেদের সত্তাকে নিটুট বলে প্রতিপন্ন করবার ঐকান্তিক আগ্রহে ভাষাকে নিয়ে খেলা করবার চেষ্টা করেন নি। বরং বলা যায়, ভাষা, যাকে অবলম্বন করেই মুখ্যত রচনাশৈলী গড়ে ওঠে, তা তাঁদের হাতের ক্রীড়ণকের মত কাজ করে চলে। অর্থাৎ মহৎ সাহিত্যকার অত্যন্ত অনায়াসে যে-কথাটা বলে যান, সে-কথা তাঁদের প্রাণেরই কথা, অনুভূতি-নিংড়ানো নিখুঁত হৃদয়ের কাহিনী—সেখানে ফাঁকি নেই, নেই বা কোনো আত্মপ্রচারের অহেতুক ও উদগ্র কামনা। Style তাঁরা গড়েন না, তাঁদের রচনার প্রয়োজন অনুসারে আপনা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তা গড়ে ওঠে। এই style-কে লোকচক্ষুর সামনে চমকপ্রদ করে তুলে ধরবার অকারণ শ্রম সেখানে নিরর্থক।

প্রাণের কথা, অনুভূতির কাহিনীই সাহিত্যের মূল বস্তু। শ্রেষ্ঠ গায়ক যেমন শ্রেষ্ঠ সাধক, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকও তেমনি সাধকশ্রেষ্ঠ। সাধনায় মিথ্যাচার নেই বলেই তিনি তাঁর হৃদয়কে পাঠকের সামনে নিরুদ্বেগে উন্মুক্ত করে দিতে পারেন, পারেন বলেই কোনো আবরণের বালাই নিয়ে তাঁকে আত্মস্থ হয়ে থাকতে হয় না। কিন্তু এখানে আর একটি বিষয় পাশাপাশি বুঝে নেওয়া দরকার। এ-প্রাণের কথা তো তাঁর আত্মারই কথা, তা'হলে তাঁকে আত্মগত বলবো না কেন? আমার উত্তর হচ্ছে, এ-আত্মাকে তিনি তিলে তিলে লালন করে আত্মগত করে নেন, এবং তাঁকে তিনি আপন রঙের মাধুরী মিশিয়ে একান্ত আপনার বস্তু করে তোলেন, এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এ-কথাটি যে, এ-আত্মাকে তিনি আহরণ করেন—আহরণ করেন হৃদয় দিয়ে, তাঁর

জ্ঞান দিয়ে, তাঁর বুদ্ধি দিয়ে। তাই অন্তরে-বাহিরে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যাকে ঢাকবার জন্য মিথ্যাই তাঁকে প্রাণপণ চেষ্টা করে মরতে হবে। ঠিক এইজন্যই নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক যতটা বেশী ঝোঁক দেন মনোলোকের সত্য বস্তুকে রূপায়িত করতে ঠিক ততটা ঝোঁক দেন না সেই রূপায়ণের প্রকাশভঙ্গিকে মুগ্ধকর করে তুলতে। কারণ তিনি জানেন, যা বাইরের অঙ্গসজ্জা তা একদিন না একদিন পুরনো হয়ে যাবেই, সে-পরিণতিকে বাধা দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব এবং সে-প্রচেষ্টা হাস্যকরও। এ-সত্য প্রমাণিত হয়ে এসেছে যুগে যুগে দেশে দেশে। কিন্তু যা অপরিবর্তনীয় তা সাহিত্যের প্রাণবস্তু। সুতরাং তার সততা পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে তাঁর সত্যোপলব্ধির ওপরে।

দেখা যাচ্ছে সাহিত্যিকের সত্যোপলব্ধি তাঁর হৃদয় মনের সত্যোপলব্ধি—এমন কি চক্ষুকর্ণেরও। এ-উপলব্ধি তো কক্ষনো দৃষ্টির ভগ্নাংশের মধ্যে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে সামগ্রিক দৃষ্টির বৃহৎ পরিধিতে। সুতরাং তার প্রকাশও বৃহৎ হবে তাতে আর বিচিত্র কি। এ-বৃহত্ত্ব তাঁর অন্তরের— আয়তনের নয়। অন্তরের এই সত্যোপলব্ধি আর সৃষ্টির এই সামগ্রিকতার সার্থক মিলনেই জাগে মহৎ সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব—এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশটারই কি অপর নাম নয় style—যে style man-এরই দ্যোতক ?

Style-এর সাজসজ্জা সারা গায়ে জরিয়ে নিয়ে সকল প্রকার সাহিত্যই গিয়ে হানা দিক সাহিত্য-রসিকদের দুয়ারে, যাতে সাধারণ পাঠকসমাজ ভুলে থাকতে চান তাই থাকুন, কিন্তু সাহিত্য সমালোচকের ভুললে চলবে না, তাঁর দায়িত্ব আরো বড়, আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আর যাই হোক, অন্তত তাঁর একটি বড় কর্তব্য, চারদিককার সমালোচনা থেকে খাঁটি জিনিসটিকে মানুষের সামনে তুলে ধরা যাতে মানুষ সত্যপথকে অন্তত চিনতে পারে। এই জন্যই চোখ-ঝলসানো রচনাশৈলী বা মন-মাতানো বাচনভঙ্গিকে সাহিত্যের বিচারে প্রধান

ও প্রথম স্থান তিনি দেবেন না, দেবেন সাহিত্যের অন্তর্বস্তুকে যা তার মূল প্রাণ। এই প্রাণবিন্দু যে রচনায় যত বেশী জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পায়, সমালোচক জানেন, সে রচনাই তত বেশী সার্থক। তাই ভাষার তীব্রতা বা বর্ণনার কটাক্ষকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে যতই কেননা আয়াসসাধ্য হোক, এ তাঁকে অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সাহিত্যকারের প্রত্যক্ষ সচেতনতাকে যদি তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব বলে ভুল করেন তা হলেই বুঝতে হবে, তাঁর প্রথম কর্তব্যই ভ্রমাত্মক পথে চালিত হয়েছে। আপাতভাবে সচেতন সাহিত্যিককেই মনে হয় অতি বেশী আত্মপ্রত্যয়ী, কিন্তু তা সে নয়, তা প্রমাণ করবেন সাহিত্যের বিচারক।

কিন্তু সমালোচনাও সাহিত্য। অতএব, যে রচনার মধ্যে দিয়ে সমালোচক সাহিত্যের বিচার করেন, সে রচনাও বিচারের অপেক্ষা রাখে। ব্যক্তিকে প্রকাশ করা যেমন সমালোচকের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য আপনার ব্যক্তিত্বকেও তেমনি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা তাঁর দ্বিতীয় কিংবা অন্যতম কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের দায়িত্বের ওপরই বিশেষ করে নির্ভর করে তাঁর আলোচনার সার্থকতা। সাধারণত দু'রকমভাবে সমালোচনা ব্যর্থ হতে পারে। নিকৃষ্ট সমালোচকের বিচারবোধ যেমন ব্যর্থ হতে পারে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিচারকের আলোচনার ব্যর্থতাও তেমনি সম্ভব। শ্রেষ্ঠ সমালোচকের রচনা যে সাহিত্যের মর্যাদা দাবী করতে পারে তাতে আর সন্দেহ কি, এবং তা যদি স্বীকার করতে কোনো আপত্তি না থাকে, তা'হলে সাহিত্যের অন্তর থেকে যেমন সাহিত্যিকের স্বকীয়তাকে তিনি প্রকাশ করার মত গ্রহণ করেন, তেমনি তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকেও তাঁর প্রকাশ করতে হয় রচনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিপদ এইখানেই। আপন ব্যক্তিত্বে যদি তিনি আলোচ্য রচনার বৈশিষ্ট্যকে পরিপূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করে রাখেন, তাহলে তাঁর রচনা যতই কেননা শক্তি ও

বুদ্ধির পরিচয় দিক তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ঠিক তার বিপরীত কারণে নিকৃষ্ট সমালোচকের আলোচনাও সার্থকতা লাভ করতে পারে না। আপন রচনার বৈশিষ্ট্য না থাকার ফলে আলোচ্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং এক কথায় বোধ হয় এই বলা যায় যে, সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করা যেমন সমালোচকের প্রথম কর্তব্য ঠিক তেমনি তাঁর আর একটি কর্তব্য হচ্ছে, আপনার ব্যক্তিত্বকে লেখকের ব্যক্তিত্বের কাছে বিলিয়ে না দেওয়া বা নিজের ব্যক্তিত্বের আবরণে তাকে ছেয়ে রাখা। আলোচ্য সাহিত্যের সঙ্গে আলোচনায় সমতা রক্ষা করাই সমালোচকের কাজ।

নতুন লেখক

সামান্যমাত্র দ্বিধা না করেই আজ বলে দেওয়া যায়, দুটি কি তিনটির বেশী অভিজাত পত্রিকা নেই বাংলাদেশে। অভিজাত বলছি অবশ্য তাদেরই যারা বিশেষ করে বিশুদ্ধ সাহিত্য হলেও বিশেষভাবে দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক ঔৎকর্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। অথচ, এ দু'তিনটি পত্রিকা ছাড়া আজ বাংলাদেশে নিতান্ত কম পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে না। একই উদ্দেশ্য যদি তাদের সমানভাবে ভাবিত করতো তা হলে, সাম্প্রতিক তো বটেই, বাংলা-সাহিত্যের তথা সংস্কৃতির নিকট-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কিছুমাত্র চিন্তা করবার কারণ থাকতো না। কিন্তু তা তো নয়ই, বরং একান্ত শঙ্কিত হয়েই লক্ষ্য করতে হচ্ছে, এত সংখ্যক সাহিত্যপত্রিকা বাজার মাতিয়ে রাখা সত্ত্বেও উৎসাহিত হওয়ার মতো বিলক্ষণ সৎসাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না। অন্তত একটি পত্রিকার নামও যদি আজ উল্লেখ করা না যেতো; যে আন্তরিকভাবে সৎ অথচ নতুন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তা হলে বিশেষ দুঃখ ছিলো না, নির্বিবাদে নবীন সাহিত্যিককুলের অক্ষমতাকেই বাংলাসাহিত্যের চরম অধঃপতনের জন্য দায়ী করে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে, অক্ষমতাটা ঠিক সাহিত্যস্রষ্টাদের নয়; বস্তুত পত্রিকা-সম্পাদক বা তার কর্তৃপক্ষেরই।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, নতুন সাহিত্যিকদের জন্য এ-ওকালতির এমন প্রয়োজন হলো কেন, তবে আমার দিক থেকে স্পষ্ট দুটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, যাঁরা অন্তত এক দশক আগেও বাংলাসাহিত্য ক্ষেত্রে দিকপাল বলে পরিচিত ছিলেন, যাঁদের যে-কোনো

একজনের রচনাকে পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্থান দিতে পারলে সম্পাদক এবং তাঁর পত্রিকার পক্ষে গর্ব করবার বিষয় ছিলো, তাঁদের প্রায় সকলেই আজ সাহিত্যক্ষেত্র থেকে লক্ষনীয়ভাবে অন্তর্হিত। যে-কোনো কারণেই হোক তাঁরা আজ সৃষ্টিকর্ম স্থগিত রেখেছেন। তাঁদের মুখাপক্ষী হয়ে থাকা সম্পাদক বা পাঠক কারো পক্ষেই উচিত নয়, শোভন তো নয়ই। দ্বিতীয় কারণটি সঙ্গে সঙ্গেই আসে অর্থাৎ তাঁদের কাছে আর যখন হাত পেতে থাকার কোনো অর্থ হয় না, তখন স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যপত্রের সম্পাদকের কর্তব্য হলো নবীন পথযাত্রীদের দিকে মুখ ফেরানো। এখানে আর একটি কথাও প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে। সাহিত্য সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ, সুতরাং কোনও দেশের সাহিত্য-ধারা যদি কিছুদিনের জন্যও স্থগিত হয়ে থাকে, তা হলে অতি দুঃখের হলেও স্বীকার করতে হবেই যে, সে দেশের সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে অধোগামী। অতএব, আজ বাংলাদেশে যদি এমন অবস্থা এসেই থাকে, যাতে প্রাচীন সাহিত্যধারাকে কিছুতেই প্রবাহিত করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন অবশ্যই নতুন সৃষ্টির উৎসমুখের সন্ধান করতে হবে। আজ এ-সিদ্ধান্ত খুব সহজেই করা যাচ্ছে এইজন্যে যে, ইতিপূর্বে ঠিক এমনিতর ঘটনা আরও একাধিকবার ঘটে গেছে এবং প্রতিবারই নব-নব উৎসাহবন্যায় বাংলাসাহিত্যক্ষেত্র প্লাবিত হয়েছে। তাই অন্তত সাহিত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ এবং সাহিত্যিকদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, যে-ভাবেই হোক, মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রখ্যাত ঐতিহ্য এতদিন বাংলাদেশকে উজ্জ্বল করে রেখেছে, তার আলোকে আজকের অসাবধানতার আপরাধে কিছুতেই ম্লান হতে দেওয়া চল্‌বে না। এ-অঘটন যদি ঘটেই তা হলে অনাগত দিনের রসপিপাসুদের কাছে আজকের দিনের আমাদের কোনো কৈফিয়ৎই যে রেখে যাওয়ার উপায় নেই।

এই অঙ্গীকৃতি তো কেবলই আত্মতৃপ্তির জন্যে নয়। কেমন করে

এ-প্রতিজ্ঞাকে কর্তব্যের পথে চালিত করা যায়, কায়মনে তার জন্যেও আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এ-কাজ শুধুমাত্র পত্রিকা সম্পাদকের নয়, শুধুই সাহিত্যিকের নয়, উভয়েরই। পারস্পরিক নির্ভরতায় যেতে হবে। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির হীনতা, আত্মপ্রচারের বিষ যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে তা হলে কোনো উদ্দেশ্যই উদ্দেশ্য নয়, তুচ্ছ সঙ্কীর্ণতার বেড়াজালে সাহিত্যের মৃত্যু ঘটা তা'হলে অনিবার্য।

অথচ, চরম দুঃখের কথা হলেও, স্বীকার না করে আজ আর উপায় নেই যে এ-হীনতা, এ-মারাত্মক বিষই অন্তঃপ্রবাহ হয়ে সংক্রামিত হয়ে চলেছে সর্বত্র। একাধিক প্রমাণের অবতারণা করা কঠিন না হলেও একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে, পত্রিকার বাজার আজ কলরবে মুখরিত কিন্তু সত্যিকারের প্রতিভাবান সাহিত্যিক বলে আখ্যাত হতে পারেন এমন কোনো নতুন লেখকের সন্ধান পাওয়া গেলো না গত কয়েক বৎসরের মধ্যে। অথচ, এ-কথাটা তো সত্যি যে, প্রতিভা প্রচেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। তবে আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়ে একজন ভালো লেখক কেন ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে পাচ্ছেন না? আমার তো মনে হয়, তার জন্য দায়ী লেখক একা নন, সাহিত্যপত্রের সম্পাদকও। আশা করি এই সত্য কথাটা প্রত্যেক সম্পাদকই জানেন যে, তাঁর কাজ শুধু রচনা-সঙ্কলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, নিশ্চিত স্বীকৃতিবান সাহিত্যিক যদি তিনি অন্তত একজনও তৈরি করে যেতে পারেন, সম্পাদক হিসেবে তাঁর কর্তব্য তবেই হবে সার্থক। সম্পাদক-সুলভ এই কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব আজ বিস্মৃত, শুধু বিস্মৃতই নয়, বরং দেখা যাচ্ছে, আজকের দিনের নতুন নতুন সম্পাদকেরা অদ্ভুত এক নির্লিপ্তিকে সম্বল করে সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করে যাচ্ছেন। অথচ তাঁরা বুঝতে রাজী নন যে, যা তাঁরা করছেন বস্তুত তা সাহিত্য-সম্পাদনা নয়, তা শুধু সঙ্কলন-প্রকাশ করা মাত্র।

কেন এমন হয় তারও প্রত্যক্ষ কারণ আছে বৈকি। আত্মপ্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে বিশেষ কোনো নতুন এবং স্বীকৃতিবান লেখককে উৎসাহ দিতে নতুন সম্পাদকেরা সাহস পান না। অথচ এই লেখকই যদি কোনো প্রত্যয়শীল বিচক্ষণ সম্পাদকের কাছ থেকে অযাচিতভাবে উৎসাহ পান, তবে নিঃসন্দেহে বাংলাসাহিত্যের রসরসিকসম্প্রাদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হতে পারেন। আমার তো মনে হয়, যদি কোনো লেখকের মধ্যে সম্পাদক সত্যিকারের সাহিত্যসৃষ্টিক্ষমতা অনুভব করতে পারেন, তা হলে তাঁর উচিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেও তাঁর রচনাকে পত্রিকার পাতায় স্থান দেওয়া। তাতে অবশ্য এমন কথা উঠতে পারে যে, পক্ষপাতিত্বের জোরেই এ-লেখক মর্যাদা পাচ্ছেন, আর কিছু নয়। তা হলেও, আমি বলি, সম্পাদককে বিচলিত হলে চলবে না। কারণ তিনি তো জানেন, অন্তত তাঁর কর্তব্যে তিনি অবহেলা করেন নি। আর যদি এমনই হয় যে যার জন্যে এত চেষ্টা, তিনি নিজে থেকেই তাঁর অক্ষমতাকে প্রকাশ করলেন শেষ পর্যন্ত, তাহলে দুঃখিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকলেও সম্পাদককে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, তাঁকে আবার খুঁজে বের করতে হবে অন্য কাউকে, যাঁর মধ্যে আছে পূর্বতন লেখকের চাইতেও অধিকতর প্রচেষ্টার স্বীকৃতি।

মোটকথা, সাহিত্যসৃষ্টিতে হুকুমের প্রয়োজন নেই, উৎসাহের প্রয়োজন আছে। এই উৎসাহের অভাবেই দেখতে পাচ্ছি, সম্প্রতি একাধিক লেখক প্রথম দিকে কিছু কিছু ক্ষমতার পরিচয় দিয়েই অকালে স্তিমিত হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থা থেকে লেখকদের বাঁচানো বোধ হয় খুব কঠিন কাজ নয়। তার জন্য প্রয়োজন সম্পাদকদের পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা এবং উদারতা। এক পত্রিকায় জনৈক রচনাকার যদি যথেষ্ট বলিষ্ঠতার পরিচয় দেন, অন্য পত্রিকা ইচ্ছা করলেই তো

তাঁকে আহ্বান জানাতে পারেন, তাতে সম্পাদক বা লেখক কারোই সম্মানহানি ঘটতে পারে না। এ-উদারতায় যদি অভাব থাকে, তবে সংকীর্ণতার দায়ে সাহিত্যপত্রগুলি সঙ্কুচিত হয়ে থাকবে তাতে আর বিচিত্র কি! অন্যদিকে আর একটা ব্যাপার সম্প্রতি লক্ষ্য করছি। প্রায় সকল লেখকের কাছ থেকে ঠিক একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—কোথায় তাঁরা লিখবেন, লিখবার মতো উপযুক্ত পত্রিকা কোথায়। এ-ও লেখকদের একপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ছাড়া আর কি। এত পত্র-পত্রিকার ছড়াছাড়ি আজ বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে—তা হলে লেখবার জায়গার অভাব ঘটবে কেন? একটু চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে, এ হচ্ছে দায়িত্বজ্ঞানহীন সম্পাদকদের উদাসীনতার প্রশ্রয়ে পালিত লেখকদের এক অদ্ভুত ধরনের অহঙ্কার। যদি সম্পাদক এবং লেখকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সৌহার্দ্য থাকে, তা হলে এ-প্রশ্ন উঠতেই পারে না। একে অন্যের সহযোগিতায় উন্নততর সাহিত্যসৃষ্টি অবশ্যই হবে বাংলাসাহিত্যে, যদি সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে সকলের।

নবীন সম্পাদকদের উদাসীনতা আর নবীন লেখকদের আত্মসৃষ্ট অহঙ্কার—এ দুয়ের যোগফলে সাহিত্যের আবহাওয়ায় এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক, যাতে, যে-দু' তিনটি অভিজাত পত্রিকা আছে বাংলাদেশে তারাই বিপন্ন হয়ে পড়বে গভীরভাবে। এমন নয় যে, প্রচুর রচনা প্রকাশ করা সম্ভব তাঁদের পক্ষে। তা ছাড়া, তাঁরাও নবীন লেখকের সন্ধানী। একদিকে যেমন তাঁরা পারেন না ক্রমাগত নতুন নতুন লেখকের রচনা প্রকাশ করতে, অন্যদিকে পারেন না একই রচনাকারের প্রতি মনোযোগী দৃষ্টি রাখতে। অথচ, এই বিপন্ন অবস্থা থেকে সহজেই তাঁরা রেহাই পেতে পারেন যদি পাশাপাশি আর সব পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের থাকে সৎসাহিত্য বিতরণের আন্তরিক

কামনা। সাহিত্যিক ও সাহিত্য পরিবেশকদের মধ্যে সত্যিকারের হৃদয়ের টান থাকলে আভিজাত্য কখনও গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। সমানভাবে সকল পত্রিকাই উন্নত মানের পরিচয় দিতে পারে—যা সাহিত্যের পক্ষে চিরদিনের কাম্য বস্তু।

সাহিত্যিক ও পাঠক-মন

বই পড়ে আনন্দ পাই, সোজাসুজি আমরা এ উক্তি করি সাধারণত কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে কথাটা ভুল, সম্পূর্ণভাবে না হলেও অন্তত আংশিক তো বটেই। কারণ সত্যিই কি আমরা যে কোন বই পড়েই আনন্দ পাই ? তা নয় তো। যাঁরা পড়াশুনা করেন, গভর্ণমেণ্ট বা মার্চেণ্ট অফিসের কেরাণী হয়েও, ব্যাঙ্ক বা মাড়োয়ারী গদীর ক্যাশিয়ার হয়েও কিংবা ইন্সিওরেন্স বা পাটের দালাল হয়েও যাঁরা অবসর বিনোদনের জন্য বই পড়েন, অথবা যাঁরা দৈনিক পত্রিকা অফিসের খবর তর্জমা করে বা কলেজের ছাত্রদের পড়িয়ে নিজেরা আরও কিছু জ্ঞানার্জনের চেষ্টা দেখেন বই-পত্রে অথবা যাঁরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে থিসিস্ দিয়ে ডক্টর হতে চান বা নিজেরাও কাগজ কলমের ব্যবহারে লেখক সাহিত্যিক হতে চান, তাঁদের সকলেরই কি একই ইচ্ছা, একই রুচি ? অবশ্যই নয়। বিভিন্ন স্তরে যেমন মানুষের বসবাস, তেমনি বিভিন্ন পরিপার্শ্ব অনুযায়ী তাদের মনের গঠন, অতএব রুচিরও তারতম্য। ফলে এ কথা কিছুতেই বলা সম্ভব নয় যে, যে কোন রকমেরই হোক বই পড়লেই শুধু মানুষের তৃপ্তি। আবার কেবল তাও নয়, এই ভেদাভেদের মধ্যেও আছে রুচির সংমিশ্রণ। যেমন, আমরা ধরে নিতে পারি, একজন বাঙালী গার্ড সারারাত ট্রেন তদারক করেও ফাঁকে-ফাঁকে সামান্য যে অবসর পান চলন্ত কামরার মধ্যে, সে অবসরক্ষণটিকে ঘুমের হাত থেকে অব্যাহতি দিতে হলে তিনি হুইলারের দোকান থেকে অবশ্যই একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস বেছে নেবেন, রবীন্দ্রনাথের গোরা বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার বই নয়। কিন্তু

আশ্চর্য, এই মানুষটিই আবার যখন একান্ত নিরিবিলিতে বসে ডেক-চেয়ারে ছুটির অবকাশ উপভোগ করেন তখন হাতের কাছে রাখেন হয়তো কোনো গোয়েন্দা কাহিনী নয়, মহুয়া কিংবা পূরবী। এই যে একই মানুষের মধ্যে সময়ের তারতম্যে রুচির তারতম্য তার হদিস পাবো কেমন করে। সে মনোস্তাত্বিকের কাজ, কিন্তু সাহিত্যিকের পক্ষে এ অবস্থায় কর্তব্য কি? দায়িত্বের প্রতি যদি চৈতন্য সজাগ থাকে, তা হলে অবশ্যই বলতে পারি, সাধারণ পাঠকের এই যে অবসরক্ষণের রুচি বদল, তার উভয় দিক্‌কেই শ্রদ্ধা করে প্রত্যেক লেখককে তাঁর কলমের সদ্ব্যবহার করতে হবে। কবিতা আমি আমার জন্য লিখি, উপন্যাস লিখি আমি বিদগ্ধসমাজের জন্য কিংবা আমার গল্পরচনার রীতিনিয়মকে যে অনুধাবন করবে এমন শিক্ষা আছে নাকি পাঠক সাধারণের? — এসব কথা অর্থহীন এবং অসারগর্ভ। যে পাঠক শরৎচন্দ্র আর প্রমথ চৌধুরীর রচনা পড়ে সমানভাবই আনন্দ পায় তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবার কোনো হেতু নেই। যদি মনে করো, শরৎচন্দ্র হৃদয়সন্ধানী আর প্রমথ চৌধুরী মননশীল, অতএব একই ব্যক্তির কাছে এ দু'জন সমানভাবে আদর পেতে পারেন না, তা হলে ধারণাটির মূলেই যে ভুল থেকে যাবে তা নয়, সে সঙ্গে পাঠককেও অপমান করা হবে চরমভাবে। কারণ এ কথা আমাদের সর্বক্ষণই মনে রাখা উচিত যে, যিনি সত্যিকারের সৎলেখক, সংজ্ঞার খাতিরে মূলত হৃদয়-ধর্মী বা বুদ্ধিজীবী যাই হোন না, তিনি সাহিত্যের সৎধর্মে বিশ্বাসী, এবং এ ধর্মরক্ষা হয় যে গ্রন্থে তা মানুষের হৃদয়ই হোক আর মস্তিষ্কই হোক, ঠিক জায়গাটিতে গিয়েই অনুভূতির ঝঙ্কার তোলে। অন্যপক্ষে, আরও একটি কথা অবশ্য স্বীকার করে নিতে হবে যে, মানুষের বাইরের দৃষ্টিগোচর প্রকৃতিটাই তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, এমন কি অনেক সময় তার আসল পরিচয়ই নয়, ব্যবহারিক চলন বলনের অভিব্যক্তি মাত্র; সুতরাং একই মানুষের মধ্যে হৃদয়ধর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে বাধা থাকতে পারে না। লেখক

ও পাঠক দুদিক থেকে দুজনকে আমরা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চেষ্টা করি তা হলে আশা করি বুঝতে আমাদের কষ্ট হবে না, সাহিত্য-সৃষ্টিতে যদি ফাঁকি না থাকে তা হলে পাঠকের মনও সাহিত্যপাঠে তৃপ্তি খুঁজে পাবেই। সাহিত্যিক এবং পাঠকের মধ্যে যে বিরোধ তা কি কখনও সাহিত্যের স্বরূপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে? তা নয়, তার সৃষ্টি হয় সাহিত্যিক ও পাঠকের মধ্যে নিজেদেরই তৈরি ভুল ধারণা থেকে। তা না হলে বিচক্ষণ সমালোচক মাত্রেই কেন এ কথাটাকে একান্ত সত্য উক্তি বলে মনে করেন যে, সৎলেখক যেমন পারেন পাঠকের রুচি ও মনকে উন্নততর স্তরে তুলে ধরতে, তেমনি অসৎ পাঠককুলও পারে সাহিত্যের মানকে একেবারে পথের ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে!

মানুষ যখন তার মুখের ভাষাকে অক্ষরের যাদুতে সাহিত্য সৃষ্টির কলাকৌশল বলে আবিষ্কার করলো, তখন থেকে আজ পর্যন্ত এত কাব্য, এত গল্প, এত উপন্যাস নাটক রচিত হলো কেন। আজই বা কেন হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত মানুষের ভাষা থাকবে মানুষের মুখে মুখে ততদিন পর্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টি হতে থাকবেই, এ শুধু সম্ভাবনা নয়, নিশ্চিত সত্য। কিন্তু কেন? শত দুঃখ সয়েও যে সাহিত্যিকেরা তাঁদের সৃষ্টিকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন তাকি শুধু জনকয়েক সমালোচককে সন্তুষ্ট করবার জন্যই। তা যদি হতো তা হলে আর এত আড়ম্বর ক'রে বই ছাপানোর প্রয়োজন কি, কি দরকার দিকে দিকে তাদের প্রচার করে। সাহিত্যরচনা কি জীবনধারণের একটা উপায় মাত্র? আজ না হয় ব্যবসাবুদ্ধির দিগন্তপ্রসারী সম্প্রসারণের ফলে সাহিত্যও হয়েছে উপজীবিকা, কিন্তু চিরকালই কি ছিলো এ রকম। সেক্সপীয়র আর কালিদাস, ভারতচন্দ্র আর বিদ্যাপতি কিংবা আরও জনকয়েক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিসাহিত্যিক হয় তো রাজানুগ্রহে জীবনধারণ করে সাহিত্যরচনা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু যারা তা পান নি, এমন কি যাঁরা দুবেলা শাকান্ন যোগাড় করতে না পেরেও এ পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে

চান নি, তাঁরা কিসের মোহে কিসের বিনিময়ে এ দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন? আর আজই বা এই ব্যবসাবুদ্ধিতে প্ররোচিত হয়ে ক'জন লেখক সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করতে পারছেন? গড় ধরতে গেলে দেখা যাবে শতকরা একজনও না। তবে এ প্রলোভন কেন? যা দিয়ে উদরপূর্তি অসম্ভব তাকেই উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করে না, এমন নির্বোধ কে! যদি এমন হতো যে মাত্র কয়েকজনের মনস্তুষ্টি সাধন করতে পারলেই সাহিত্য কর্মে সার্থকতা আসবে, যদি এ বিশ্বাস প্রচলিত সত্য বলে প্রমাণিত হতো, তা হলেও না হয় একটা কথা ছিলো। সমসাময়িক কালের সমালোচকদের ডেকে এনে, পড়ে শুনিয়ে, সাহিত্যকর্মের দায়িত্ব পালন করা যেতো। কিন্তু সমালোচকদের জন্যই তো আর সাহিত্যরচনা হয় না, সংখ্যায় তাঁরা আর ক'জন। অগণিত পাঠকসাধারণের তুলনায় সে সংখ্যা তো নগণ্য মাত্র, প্রায় শূন্যের কোঠায়। সাহিত্যিক থাকে না, সমালোচক থাকে না, কিন্তু সাহিত্য থাকে। সে কার জন্য? হাজার হাজার পাঠক-জনের জন্যেই তো। কি এসে যায় যদি আমরা চসার বা মিল্টনের চেহারা কেমন ছিলো জানতে না পারি; গ্যেটে আর রবীন্দ্রনাথ অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ ছিলেন একথা হয়তো একদিন ইডিয়ম হয়ে বিশেষ কোনো অর্থের ব্যঞ্জনা বহন করবে, তাতে ফাউষ্ট বা গীতাঞ্জলির কি এসে যায়! যে সাহিত্য প্রত্নতাত্ত্বিকের আবিষ্কারকে গৌরবোজ্জ্বল করে তার কথা বলি না, সাহিত্য-রসিকের চোখে তার ম্লানিমা ধরা পড়ে যায় বলেই তো তা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়বস্তু। কিন্তু যুগে যুগে সমাজব্যবস্থা আর তারই অঙ্গাঙ্গী মানববুদ্ধির রিয়াল সেন্স-এর মার খেয়েও যে সাহিত্য টিঁকে রইল হীরকের দ্যুতি নিয়ে তার পরিচয় কি? সমালোচকের বাহবার ওপর নির্ভর করেই যদি সাহিত্য রচনা করতে হতো তা হলে মিল্টন বসে বসে প্যাম্ফলেটই লিখতেন. রবীন্দ্রনাথ জুড়িগাড়ী চেপে রওনা হতেন হাইকোর্টের দিকে।

আসলে পাঠকের মুখ চেয়েই সাহিত্য জন্ম নেয়, সমালোচককে খুশি করবার জন্য নয়। আর মুখ চেয়েই যদি তবে মন মেনেও বটে—মুখ তো মনেরই আয়না। সুতরাং গোড়াতেই যদি পাঠকের মনকে আমি চিন্‌তে না পারি তাহলে কেমন করে সাহিত্য সৃষ্টি করবো। অবশ্য লেখকদের সুবিধার জন্য জনৈক মহাজন বলে গেছেন, বিপুলা পৃথ্বি আর নিরবধি কাল, সুতরাং ঘাবড়ালে চলবে না, একদিন-না-একদিন ঠিক জায়গা করে নিতে পারবে তোমার রচনা। কিন্তু এ মহাজনবাণী তো সব রচনার প্রতিই শ্রদ্ধা জানিয়ে উচ্চারিত হয়নি, এমন ধারণার সম্ভাবনা থাকলে ঋষিপ্রবর নিশ্চয়ই বাকসংযম করতেন। তাহলে বিপুলা পৃথিবীতে আর নিরবধি কালে হতাশ হওয়ার কারণ নেই—যদি সাহিত্যিক মর্যাদা তোমার আমার লেখার কিছু থাকেই তবে তা একেবারে ব্যর্থ হবে না, একদিন কোনো সৎপাঠক তাকে উদ্ধার ক'রে লোকচক্ষুর গোচরে আনবেই। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বেঁচে থেকে যে কবি অন্তত একজনও অপরিচিত পাঠক খুঁজে পেলেন না, মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পর তাঁকে নিয়ে যখন হৈচৈ পড়ে যায়, তখন নিরবধি কালের ওপর বিশ্বাস না-রাখাই যে বোকামি। আমি জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স-এর কথা বলছি। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, অন্যতম বন্ধু কবি রবার্ট ব্রিজেস্ ছাড়া তাঁর জীবিতকালে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তাঁর কবিতা পড়েননি কখনও, পাঠকমহল তো দূরের কথা। ছাপার হরফে নিজের কবিতাকে রূপ পেতে দেখে যান নি হপকিন্স। এতবড় একজন নামী কবি হয়েও কেন যে রবার্ট ব্রিজেস তাঁর বন্ধুকে প্রকাশিত করলেন না পাঠকের সামনে সেটা রহস্যময় হয়ে থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি, সে সময় যদি হপকিন্সের কোনো কবিতা প্রকাশ পেতো সমসাময়িক পত্রপত্রিকায়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই এতদিন অবহেলায় আত্মগোপন করে থাকতো না। ইংলণ্ডের কাব্যরসিককুল এ জন্য দায়ী, ভাবতেও অবাক লাগে; অবশ্যই তা নয়, কারণ প্রত্যক্ষ-গোচর কোনো সৎকবি অবহেলিত

হয়েছেন সেখানে তার নিদর্শন আর দ্বিতীয়টি নেই। আসলে এ দুর্ঘটনার জন্য যাকে দায়ী করা যায় তিনি কোনো অঘটন-ঘটন পটিয়সী ছাড়া আর কেউ না। সুতরাং হপকিন্সের এই দুর্ঘটনাটিকে একটা আকস্মিক ব্যতিক্রম বলে ধরে নেওয়াই বোধ হয় সঙ্গত। তাহলে সমসাময়িক কালের পাঠকদের ওপর আস্থা স্থাপন না করার তো কোনো কারণ দেখি না। যদি ভবিষ্যৎ-এর ওপরই ভরসা করা যাবে তবে প্রত্যক্ষ সত্য এই বর্তমানকেই বা কেন বিশ্বাস করা যাবে না। সামাজিক সত্যের চেয়ে চিরকালীন সত্য সাহিত্যের পক্ষে যে ঢের বেশী সার্থক উপকরণ তা মহাকবি বাল্মীকি থেকে এই যন্ত্রযুগের অতি বড় যুক্তিবাদী লেখল আল্ডুস হাক্সলি বিনীতভাবেই স্বীকার করেছেন। চিরকালীন সত্য তো আর বাজারের চালু হ্যাট-কোট-টাই বা নবতন ডিজাইনের জুতো-মোজা-চশমা নয়, যে পুরনো হয়ে গেলো তো তার মূল্যও গেলো কমে ; চিরকালীন সত্য হৃদয়ের সত্য, পৃথিবীর বিবর্তনেও তার রূপ বদলায় না, মূল্য কমে না। বিদ্রোহী হলেও পলিনিকাস ভাই ; তাই তার মৃত্যুতে এন্টিগোনের যে হাহাকার, নিজের জীবনের বিনিময়েও যে সে তার মৃত ভাই-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধা বোধ করে নি, স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসার এ-সত্যকে হঠাৎ-ই একদিন আবিষ্কার করেছিলেন সোফোক্লেস, না, তা আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে! আর এ সত্যকে চিনতে যদি পাঠকের কোনো ভুল না হয় তা'হলে নিরবধি কালেয় অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে কেন সাহিত্যিককে? সমালোচকের হাততালি তাকে সম্মানিত করুক বা না করুক পাঠকের তাতে কিছু এসে যায় না, নিজেকে, নিজের হৃদয়কে, হৃদয়ের সত্য উপলব্ধিকে যদি সে খুঁজে পয়ে, তবে যে কোনো কালের হোক, যে-কোনো রচনাকারের হোক, সে রচনাকে সে সৃষ্টি বলে চিনে নেবেই।

পাঠকের মনকে যেমন বুঝতে হবে, সাহিত্যিকের মনকেও কি

তেমনি বুঝতে হবেনা পাঠকদের ? সাময়িক বিপর্যয়ের ফলে এমন যদি হয় যে, সমসাময়িক পাঠক সম্প্রদায় সামগ্রিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, কারণ পরিপার্শ্বকে অস্বীকার করে মানুষ বাঁচতে পারে না এবং সামাজিক অবস্থারও মাঝে-মাঝে উত্থান-পতন ঘটে নদীর জোয়ার ভাটার মতো তা'হলে পাঠকমহল নিকৃষ্ট রচনার উত্তেজক বিষয়বস্তু থেকে তাদের খোরাক সন্ধান করে নিতে যে সচেষ্ট হবে, সেটা কিছু বিচিত্র নয়। আর একটু আগে যে বলেছি পাঠকদের মুখের দিকে তাকিয়ে লেখককে কলমে হাত দেওয়া উচিত, তা যদি সত্য হয়, তা'হলে তো এ অবস্থায় নিকৃষ্ট রচনাই অনবরত তৈরি হতে থাকবে তাদের জন্য। সাহিত্যের পক্ষে সে যে কতবড় দুঃখের কথা তা বর্ণনা করাও অসম্ভব। এ অবস্থায় সব চেয়ে কঠিন কাজটিকে দায়িত্ব বলে গ্রহণ করতে হবে পাঠকদেরই— সৎসাহিত্যকে চিনে নেবার দায়িত্ব। সৎ-সাহিত্যিক যে একই কালে হামেসা চোখে পড়ে না তা তো জানাশোনা কথাই। অন্তত যন্ত্রযুগের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এ-ক্ষেত্রেও সাহিত্য কম কলুষিত হয়নি এই বিংশ শতকে। প্রতি-দ্বন্দ্বিতা যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাজ্ক্ষা থেকে জন্ম নেয় দোষ নেই, কিন্তু ধনতন্ত্রের অপার মহিমায় আজ এ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্ম নিচ্ছে ধনবৃদ্ধির আকাজ্ক্ষা থেকেই। ফলে, অবধারিত ভাবে হৃদয়বোধে আন্তরিকতার অভাব দেখা দিয়েছে এবং সাহিত্যধারাও নেমে চলেছে নীচের দিকে। এ-অবস্থায় সৎ-সাহিত্যকে চিনে নেবার উপায় কি। আশ্চর্য হওযার কারণ নেই, ভালো বই পড়ে ভালো লাগবে, কিন্তু খারাপ বই পড়ে কেন খারাপ লাগলো এ কথাটা সাধারণ পাঠক যেমন বুঝতে পারে না সহজে, তেমনি অন্য কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে না। অথচ এ-সম্বন্ধে যদি একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করে না নেওয়া যায় মনের মধ্যে তা'হলে কোন্ বই পড়া উচিত এবং কোন্ বই নয়, তার হদিশ তারা পাবে কেমন ক'রে।

এ-দায়ই সমালোচকের। একদিকে তিনি যেমন সাহিত্যিক, অন্যদিকে তেমনি পাঠকও। সৎলেখক না হতে পারেন সৎপাঠক অবশ্যই। সৃজনশীল রচনাকারের প্রয়োজন নেই সমালোচকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার, তাকে মনে রাখতে হবে পাঠকদের মনকেই। কিন্তু এ পাঠক তৈরি করবে কে, সাহিত্যিক নিজে? না, এ ভার সমালোচকের। এটা সত্যি যে, সমালোচক খুসী হলে একজন লেখককে বড় ব'লে বড় করতে পারেন, আবার ছোট ব'লে ছেটে করতেও পারেন ; কিন্তু তার মূল্য কতটুকু। ডক্টর জনসন বিরূপ ছিলেন জোনাথান সুইফট আর টমাস গ্রে'র প্রতি, এমন কি সেক্সপীয়রের প্রতিও, কিন্তু তাঁরা কেউ অপযশের অন্ধকারে চুপসে জান নি ; কাউকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন কোলরিজ, কাউকে ম্যাথু আরনল্ড বা আর কেউ। সমালোচকের দায়িত্ব তাই খুব সহজ নয়। সৎপাঠক তৈরি করাও যেমন তার কাজ, তেমনি পাঠকের চোখে সৎ-লেখকের পরিচয়কে ধরিয়ে দেওয়াও তেমনি তার কাজ। একদিকে যদি ভুল হয়, ভারসাম্যে যদি টান পড়ে, তাহলে ফলাফল দাঁড়ায় মারাত্মক হয়ে —শেলী বায়রণ তার প্রমাণ, সমালোচকের নিন্দা-প্রশংসায় তাঁরা কতবার ভাসলেন, ডুবলেন কতবার, তার খবর তো ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকমাত্রই জানেন। সমালোচক তাই লেখক হয়ে লেখকের মনকে আবিষ্কার করবেন, পাঠক হয়ে আবিষ্কার করবেন পাঠকের মনকে। উভয় দিকে ভারসাম্য যদি রক্ষা না পায় তাহলে সাহিত্যিক বা পাঠক— কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না একে অন্যকে চিনে নেওয়া। তাঁরই দৃষ্টির মাধ্যমে সৎ লেখককে চিনে নেবে পাঠক। তাঁর বুদ্ধিবিচারের অগ্নি-পরীক্ষাতেই প্রকাশিত হবে সৎসাহিত্যের স্বরূপ আর আত্মশুদ্ধি ঘটবে পাঠককুলের। এ সমন্বয় যদি কখনও ঘটতে পারে তখন আর প্রয়োজন হবে না সমালোচকের, তার বিচারবোধের। সাহিত্যিকপাঠকের-সরাসরি যোগসূত্র স্থাপনই যদি হয় সাহিত্যের লক্ষ্য, সেদিন তবে

সমালোচকের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তা হতে পারবে বিনা বাধায়। কারণ তাঁর কর্তব্য সেদিন নিঃশেষিত। সে সুদিন কখনও আসবে না জানি, কিন্তু আমরা সু-লেখক হ'য়ে সৎপাঠক হ'য়ে পারি নাকি এমন ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আদান-প্রদান করতে যার ফলে সমালোচকের শিক্ষকতার অবসান না হোক অন্তত তাঁর প্রয়োজন অনেকটা ক'মে আসতে পারে?

সাহিত্য-আন্দোলন

নদীর জোয়ার-ভাটার মতো শিল্পসংস্কৃতির উত্থানপতনটাও যেন অবধারিত। জোয়ার-ভাটা সময়ের হিসাব মেনে চলে, কিন্তু সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি বোধ হয় কোনো হিসাব নিকাশের নির্দেশ মানে না। তাই, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে যখন বাংলাদেশের সাহিত্যে প্রায় স্থিতাবস্থা দেখা দেয়, তখন ঠিক এমনতর অবস্থা আর কখনও বাংলাসাহিত্যের পক্ষে এসেছিলো কিনা ভাবতে গেলে দেখা যায়, প্রায় একশ' বছোর আগে অনেকটা এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো। কিন্তু প্রকৃতির ভেদ আছে। তখনকার দিনের দুরবস্থা আজ আর আমাদের ভোগ করবার মতো দৈন্য নেই। তাই, কিছু হচ্ছে না বা বাংলাসাহিত্য রসাতলে গেলো বলে চীৎকার না করে এ' অবস্থাসৃষ্টির যথার্থ কারণ কি তা ভালো করে বুঝে দেখা ভালো।

সাহিত্য একার সাধনার বস্তু, এ-কথাটা বারবার শুনতে শুনতে আমরা এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, আজ যেন মনে মনে বিশ্বাস না করলেও অন্তত মুখ ফুটে বলতেও সংকোচ বোধ করিনা, সত্যই সাহিত্য একার সাধনার বস্তু, দল বেঁধে কখনও সাহিত্যসাধনা হয় না। দল বেঁধে যে সাহিত্যসাধনা বা কোনো মহৎ সৃষ্টি হয় না তা তো সত্য কথাই; কিন্তু এ-কথাটাও ভেবে দেখা দরকার যে উনিশ শতকীয় সাহিত্যাদর্শকে সামনে রেখে সৃষ্টিকার্যে মনোযোগ দেওয়া আজ আর সম্ভব কি না। অন্যপক্ষে, আক্ষরিক অর্থে রচনাকর্ম মাত্রকেই সাহিত্য নামে আখ্যায়িত করে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালানোর মধ্যেও

সাহিত্যিক-স্বীকৃতির আন্তরিকতা আছে কিনা তাও আজ বিচার করে দেখবার প্রয়োজন আছে।

সামাজিক, এমন কি নিছক সাহিত্যিক প্রয়োজনেই যখন সাহিত্যকে নেমে আস্‌তে হয়েছে অপার্থিব শুভ্রসৌধ থেকে, তখন নতুন করে নতুন ভাবে তাকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলবার প্রয়োজন আছে বৈকি, ব্যবহার প্রণালীটাও তাই প্রয়োজনবোধে নতুনতর হতে বাধ্য। আসল সমস্যাটা এখানেই। ঐতিহ্যপ্রীতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে কোনো কোনো রচনাকার যদি সাহিত্যে মিনারবিলাসকেই এখনও আঁকড়ে ধরে রাখতে চান, তা হলে যেমন তাঁকে অপরাধী বলে কাঠগড়ার দাঁড় করানো সম্ভব নয়, তেমনি পথের ধূলোয় এবার যখন সাহিত্যকে নেমে আসতে হয়েছে তখন বাস্তববাদের আতিশয্যে যদি তার গায়ে কেউ ধূলোকাদাই মাখতে চান তা হ'লে তাঁকে প্রতিহত করা সহজ নয়। অথচ দুটো পথই যে ভ্রান্ত, এ-কথাটা যথার্থ সাহিত্যরসিককে বুঝিয়ে দিতে হয় না।

একটা মধ্যপন্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়—কিন্তু কি করে যে সত্যই সে-পথের সন্ধান মেলে সাম্প্রতিককালের বাংলাসাহিত্যস্রষ্টারা বোধ হয় তা-ই বুঝে উঠতে পারছেন না। যে দুটি স্তরের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, আজকের সাহিত্যক্ষেত্রে এই উভয় স্তরের সাহিত্যিকেরই তো সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত পরিধিতে নিজেকে সীমিত করে একদিকে যেমন সৃষ্টিকার্য চলছে, তেমনি আর একদিকে যা-হোক-কিছু লেখাকেই সাহিত্যকর্ম বলে প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়ারও বিরাম নেই। কিন্তু যার জন্যে এত পরিচর্যা আর এত পরিশ্রম, সত্যিকারের সে-সাহিত্যসৃষ্টি আজ সত্যিই কি বাংলাদেশে হচ্ছে? গতি যেন কোথায় এসে আটকে গেছে, অন্ধের মতো ঘুরপাক খেয়ে মরছে সেখানেই—কিন্তু বাঁধভাঙ্গা মুক্তির স্রোত সে হারিয়ে ফেলেছে।

আসল কথা, মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করবে যে পুরোহিত তাকে চাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভারই যে প্রয়োজন এমন কথা বল্‌বো না, কারণ এ-মুহূর্তে তা অসম্ভব। শুধু তা-ই নয়, পাশাপাশি যখন দেখতে পাই বার্ণার্ড'শ'-কে কোনো দলের পুরোধার পদে অভিসিক্ত না করেও ইংরাজী সাহিত্য পিছিয়ে যায় না, উদ্দাম স্রোতোবেগে এগিয়ে চল্‌তে পারে ফরাসী সাহিত্য রোমাঁ রোলাঁর অনুপস্থিতিতেও, তখন আমরাই বা কেন রবীন্দ্রনাথের অভাবের মর্মবেদনাকে অহেতুক বুকের মধ্যে লালন করে দিকচিহ্নহীন প্রান্তরের মধ্যে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াবো! রবীন্দ্রনাথ না আসুন কিন্তু যিনি আসবেন তাঁকে ভ্রান্তিহীন অকুণ্ঠ সেনাপতি হতে হবে। কক্ষে কক্ষে মালাগাঁথার প্রতিবাদ যদি করতে হয়, প্রতিবাদ করতে হবে তাঁকে সাহিত্য-নামধারী অশুভ বাস্তববাদের বিরুদ্ধেও। সাহিত্য রাজনীতি নয় স্বীকার করি, কিন্তু যখন স্বীকার করি দিশা হারিয়ে গেছে সাহিত্যপথের তখন অস্বীকার করবো কেন তার দিশারীকে।

অবশ্য এ-কথা সত্য যে, প্রচার করে যেমন রাজনৈতিক নেতা সৃষ্টি করা যায়, প্রচার করে তেমনি সাহিত্যের নেতা সৃষ্টি করা যায় না। তা অসম্ভব। সুতরাং, সাহিত্যরসিক আর তথাকথিত সাহিত্যসেবীর প্রয়োজনে নয়, নিজেরই আত্মার তাগিদে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে এ-সাহিত্যকাণ্ডারীকে—বলিষ্ঠ আহ্বানের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই আত্মপ্রচারের জয়ডঙ্কা বাজাবার, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ যদি অপরিহার্য হয়, তবে আসবেই সে-সময় যখন তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে মহৎ সাহিত্যচক্র, সাহিত্যের গতি নির্ণিত করবে যারা। এ-ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না বলেই একদিন বঙ্কিমচন্দ্র আপনা থেকেই পুরোধা হয়েছিলেন একটা বলিষ্ঠ সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর, রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুল্‌তে পেরেছিলেন রবীন্দ্রযুগ। আঁদ্রে জিদ্‌কে তাই প্রচারের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়নি, অপেক্ষা করতে হয়নি জ্যাঁ-পল সার্ত্র্‌কেও। তাঁরা প্রচারিত হয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন আপন

ব্যক্তিত্বেরই বিকাশে। মিনারবিলাসী কি তাঁরা, কিংবা অতিবাস্তববাদের ধুয়োধরা পঙ্কিল পথযাত্রী সাহিত্যসৃষ্টিপ্রয়াসী? ব্যক্তিত্বের উন্মোচনে তাঁদের দ্বিধা নেই, শংকা নেই; আত্মবিশ্বাসকে তাঁরা অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করতে ইতস্তত করেন না। সাহিত্যকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন প্রকাশ করেছেন তেমনি ভাবে, আন্তরিকতায় সুস্পষ্ট, গভীরতায় নিবিড়। তাই আজ যদি আমরা দেখতে পাই, তাঁদের কেন্দ্র তাঁদের সাহিত্যকে সাম্‌নে রেখে একটা আন্তরিক সাহিত্য-আন্দোলন শুরু হয়েছে ফরাসী দেশে যার ফলে সে-দেশের সাহিত্যধারা হঠাৎ কোথাও গতি হারিয়ে ঘুরপাক খেয়ে মরছেনা বরং এগিয়ে চলেছে প্রগতির বিচিত্র ধারায়, তা হলে আমরা বিস্মিত হবো কেন?

আর অস্বীকারই বা করবো কেন এ-সাহিত্য-আন্দোলনের প্রয়োজনকে! হয়তো কেউ কেউ বলবেন, বাংলাসাহিত্যেও তো আজ সে-আন্দোলন চল্‌ছে, সুতরাং তাকে অস্বীকার করবার প্রশ্ন উঠবে কেন? কিন্তু সাহিত্যের নামে আন্দোলন চালালেই যে তাকে সাহিত্য-আন্দোলন বলে গভীর শ্রদ্ধায় নতমস্তক হতে হবে তা-তো নয়। সমাজ-শাসনের প্রাচীর ভেঙ্গেছে, নতুন দিনের আলো এসে পড়েছে বৃহত্তর প্রাঙ্গণে—এ কাহিনীটা যেমন সত্য, হয়তো তেমনি সত্য যে এ-কাহিনীকে সাহিত্যের পাতায় গেঁথে তুলবার চেষ্টা চলছে একদল সাহিত্যিকের মধ্যে। কিন্তু তার চেয়েও সত্য নয় কি যে, সে মহৎ কাজের প্রয়াসটার চাইতে আজ ডামাডোলের আওয়াজটাই একটু বেশী! আজকের দিনে যে-কথাটা বল্‌তে হবে, যেমন করে বল্‌তে হবে তার নিখুঁৎ নির্দেশ তো কই পাওয়া যাচ্ছে না সেখান থেকে। সাহিত্যের নামে যে আন্দোলন চলছে সেখানে—সেখানে প্রচেষ্টার ঘোষণাটাই সরব হয়ে উঠ্‌ছে বারবার।

তাই, বাংলাদেশে বোধ হয় একথাটা আজ একবার বিশেষ করে ভাববার সময় এসেছে, পরিবর্তনের পালা ডিঙিয়ে সমাজবিবর্তনের গা

যে যে আজ সাহিত্য যে রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে তাকে এখনও ঠিকমতো স্পষ্ট করে চেনা গেছে কিনা। সাহিত্যসৃষ্টি কার জন্যে, এ-চিন্তাটাকে সম্প্রতি মুলতুবি রেখে সাহিত্যের এ-নতুন সংজ্ঞা কি তা-ই না হয় নিরূপিত হোক এখন—প্রচারের কাজটা পরেই না হয় হবে। দল বেঁধে যে এই অবশ্য-করণীয় কর্তব্যটা হতে পারে না, তা অস্বীকার করবে কে, কিন্তু নিষ্কম্প কণ্ঠে যিনি সত্যিকারের মতটিকে ঘোষণা করবেন তাঁর উপস্থিতিটা যে আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। দিক-দিশাহীন নৈরাজ্য চালানোর অন্য নাম আন্দোলন হলেও তা ধ্বংসাত্মক, গঠনমূলক নিশ্চয়ই নয়!

২

সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে যুগে যুগে প্রায় সকল দেশেই এক একটা সাময়িক আন্দোলন সৃষ্টি হয়ে এসেছে এবং সে-সাহিত্য এক সময় প্রাচীন বলে আখ্যায়িত হলেও তার ঐতিহ্যকে বহন করেই অর্বাচীন সাহিত্যধারা রসসঞ্চয় করে চলেছে। উক্তিটা যে মিথ্যে নয়, তা বৈদেশিক সাহিত্যের ইতিহাসের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টাও করেছি। সে-সঙ্গে এ-বক্তব্যটাও আমার ছিলো যে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসটাই যথেষ্ট নয়, এই আন্দোলন মঙ্গলময় সার্থকতায় শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে যদি তার কেন্দ্রমূলে থাকে এমন কোনো সাহিত্যিক যাঁর ব্যক্তিত্ব ও অঙ্গুলিনির্দেশ সে-সাহিত্যের গতিকে স্বচ্ছন্দ করে দিয়ে যেতে চায়। সাহিত্যের এ-পুরোধা এবং সাহিত্যের এ-আন্দোলনের ফলে আধুনিক বাংলাসাহিত্যও সত্যিই প্রগতির পথে এগিয়ে এসেছে কি না তা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বিচার করলে সহজেই জানা যেতে পারে।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের গোড়াপত্তন হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে। আধুনিক শব্দটির অর্থ যেহেতু আপেক্ষিকতা-নির্ভর সেহেতু বিশেষ কোনো মান দিয়ে বলা সম্ভব নয়, ঠিক কোন্ সময় থেকে বাংলাসাহিত্যে এই আধুনিকতা শুরু হয়েছিলো। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রকে আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টাদের আদিনায়ক বলা এই কারণে সঙ্গত যে, বস্তুত তাঁর আগে যে সাহিত্যসৃষ্টি চলছিলো তা শুধু সৃজনপ্রয়াসেই পর্যবাসিত হচ্ছিলো- তার বেশী আর কিছু নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সাহিত্যধারায় এমন একটা মৌলিক ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হলো যা একান্তই বাংলাসাহিত্যে অভূতপূর্ব এবং তখন থেকে যে সাহিত্যসৃষ্টির প্রবর্তন হলো, আসলে আজকের দিনের সাহিত্যের মূল উৎস সেখানেই। এ-কথা মানতে নিশ্চয়ই কারো আপত্তি নেই। সুতরাং এক কথায় বঙ্কিমচন্দ্রকে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের আদি স্রষ্টা বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর সাহিত্য আপন বৈশিষ্ট্যে একক হলেও তাঁর পরিপার্শ্বে থেকে আরো যাঁরা এ-পথে যাত্রা করেছিলেন, তৎকালীন সাহিত্যের বিচারে তাঁদের দান কিছু কম ছিলো না। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে হলে তাঁদের অনেকেরই নাম অবশ্য স্বীকার করতে হবে। আপাতভাবে 'বঙ্গদর্শনকে' কেন্দ্র করে এ-লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠলেও, কে-না জানে যে, এ-গোষ্ঠীর অগ্রনায়ক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রই। শুধু তা-ই নয়, তিনি কেবল-মাত্র সাহিত্যিকসম্পাদকই ছিলেন না, সাহিত্যিকগোষ্ঠী তৈরি করবার মতো দক্ষতাও তাঁর ছিলো। সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্গদর্শন যে উজ্জ্বল ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছে তা-ই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রমাণ; সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যপথের যথার্থ পরিচালকও ছিলেন, তা না হলে তাঁর উত্তরসূরীরা এত সহজে পথ চিনে নিতে কিছুতেই সক্ষম হতেন না।

তারপর রবীন্দ্রযুগ। মিনারবিলাসী বলে রবীন্দ্রনাথকে দূরে সরিয়ে

রাখার চেষ্টা বিফল, কারণ 'ভারতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা না হলেও তিনিই ছিলেন ভারতীর লেখকসম্প্রদায়ের আদর্শ। নিজেকে যদি তিনি আপন পরিমণ্ডলের মধ্যেই গুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন, তা হলে নিঃসন্দেহেই বলা যায়, যত মাধুর্যই তিনি বুলোন না কেন, তাঁর সে নিষিদ্ধপ্রবেশ দ্বারপথের বাইরে যাঁরা পড়ে থাক্‌তেন, তাঁরা কিছুতেই আর এমন উৎসাহে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণায় উচ্ছল হয়ে উঠতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ আপন মনের মাধুরী মিশায়ে যা-ই রচনা করুন না, সে মাধুরীর সন্ধান পেয়েছিলেন আরো কেউ, আবো অনেকে। তাই, এক ভারতীই রবীন্দ্রযুগের সাহিত্যধারার বাহক নয়, বিভিন্ন কালে রবীন্দ্রনাথ যতবারই বিভিন্ন সাহিত্যপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন ততবারই দেখা গেছে তাঁকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এক-একটা সাহিত্যিকগোষ্ঠী। অবশ্য এ-কথা সত্যি যে, যাঁদের নিয়ে এ-সম্প্রদায় তৈরি হয়ে উঠেছিলো তাঁদের প্রায় কেউই তেমনভাবে স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু তার কারণ ছিলো। রবীন্দ্রপ্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে তাঁদের ক্ষীণ দীপশিখা শুধু খানিকটা ম্লান আলো ছড়িয়েই যে ক্লান্ত হয়ে নিভে গিয়েছিলো তা-ই নয়, তার চাইতেও সাহিত্যিকের পক্ষে যা গ্লানিকার সেই অনুবর্তনস্পৃহাই তাঁদের কাউকে আর আপন বৈশিষ্ট্যে বিশেষ করে চিহ্নিত হবার সুযোগ দেয়নি। তথাপি রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে একসময় যে একটা সাহিত্য আন্দোলন বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিলো তাকে অস্বীকার করবার উপায় কি! কিন্তু এ-অভিভাবকত্ব তাঁকে নিজে থেকে হাতে তুলে নিতে হয়নি, তাঁর অনস্বীকার্য ব্যক্তিত্বের কাছেই এসে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিনের সে সাহিত্যস্রষ্টার দল।

এ-ব্যক্তিত্বকে যদি স্বীকার করে নেওয়া না যায়, তবে প্রমথ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠাকে গ্রহণ করবো আমরা কোন্ যুক্তিতে? রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে, শুধু জীবিতকালেই বা কেন, রবীন্দ্রপ্রতিভা যখন সূর্য-

প্রতিম, তখনই তো দেখি, নতুন করে নতুনভাবে সাহিত্যপথকে গড়ে তুলতে সুরু করেছেন প্রমথ চৌধুরী। এমন তো নয় যে তিনি কেবলই ব্যর্থ পরিশ্রম করে গেছেন। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় তাঁর সে-অসাধ্যসাধনের কাজে এসে হাত মিলিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, ইচ্ছা করলেই যিনি অত্যন্ত অবহেলায় অস্বীকার করতে পারতেন প্রমথ চৌধুরীকে। কিন্তু তা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সহিষ্ণু মন তাঁকে গ্রহণ করে নিতে পেরেছিলো এইজন্যে যে, কল্যাণের পথকে তিনি তাঁর মধ্যে ঋষির দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। তাই 'সবুজপত্র' প্রায় অকস্মাৎই একদিন বাংলাসাহিত্যে আপন প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে একটা সাহিত্য-আন্দোলনের বাহন হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলো। হয়তো সত্য যে সে-আন্দোলন বিশেষভাবে সেদিন ব্যাপকতা লাভ করেনি, তথাপি, যত সীমাবদ্ধই হোক, এ-কথা ঠিক যে, সে-আন্দোলনের ফলেই পরবর্তী কালের সাহিত্যধারা ভাবে-ভাষায় একটা নতুন দিকদর্শনের ইঙ্গিত পেয়েছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন একদিন ইংরাজী সাহিত্যের ভাবনা-ধারণাকে এনে হাজির করেছিলেন বাংলাসাহিত্যের আসরে, প্রমথ চৌধুরীও তেমনি আর একবার নিয়ে এলেন ফরাসী সংস্কৃতিকে। আমাদের সাহিত্যের গায়ে যেমন একটা নতুন হাওয়া লাগলো, তেমনি করে চিন্‌লাম সাহিত্যের এই নতুন পরিব্রাজককেও। প্রমথ চৌধুরীর মূল্যমান এইটুকু কাজের মধ্যে যে নির্ণীত হবার নয়, তা বলাই বাহুল্য, কারণ পথ দেখিয়ে দেওয়াই তো তাঁর একমাত্র কাজ ছিলো না, তাঁর দায়িত্ব ছিলো বিশেষ একটা আন্দোলনকে সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা—তিনি নিজে যার স্রষ্টা, যার প্রধান পুরোহিত। আমরা জানি, তিনি সার্থক হয়েছিলেন, তা না হলে আজকের দিনের এই সহজ সচ্ছল সাহিত্যের ভাষাকে বোধ হয় এখনও আমরা চিনে নিতে পারতাম না।

কথাসহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের যেমন অনন্যপ্রতিষ্ঠা, তেমনি তিনি কোনো সাহিত্য-আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন কিনা, তার বিশেষ

কোনো প্রমাণ অবশ্য নেই। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোনো সাহিত্যিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, তা স্পষ্টতই জানা যায়। কিন্তু তাঁর জীবনের যতটা অংশ গোচর, তার অনেক বেশী বোধ হয় অগোচর। তথাপি, যতটুকু জানা গেছে, তাতেই এমন প্রমাণ আছে যে, গুরুগিরি ফলাবার উৎসাহ একসময় তাঁরও কিছু কম ছিল না। তিনি নিজেও একসময় এমন কথা বলেছেন, '—তখন যাঁদের গুরুগিরি করিয়াছিলাম, এখন তাঁরা আমাকে ডিঙাইয়া এত উঁচুতে গিয়াছেন যে, তাঁদের নাম যদি করি, আপনার বিস্ময় রাখিবার স্থান থাকিবে না যে, আমি তাঁদেরও একসময়ে লেখা পড়িয়া কাটিয়া-কুটিয়া দিয়াছি, ভালমন্দ মতামত প্রকাশ করিয়াছি এবং পথ দেখাইয়া দিয়াছি!' লক্ষ্য করবার বিষয়, কোনো সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের পুরোভাগে থেকে একজন সাহিত্যিকের পক্ষে যা করা সম্ভব এবং উচিত একসময় শরৎচন্দ্রও তা-ই করেছিলেন। যত অল্প বয়সেই হোক, যাঁদের তিনি একসময় পথ দেখিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা যে কোনোদিনই তাঁকে ডিঙিয়ে যেতে পারেন নি তা আমরা জানি, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা কি শুধু ঐ গুরুগিরি ফলাবার উৎসাহেই, না কি এ-দায়িত্ব আপনা থেকেই এসে তাঁর ওপর আরোপিত হয়েছিলো। এ-প্রশ্নের উত্তর তিনি না দিলেও তাঁর শক্তি এবং প্রতিষ্ঠাই প্রমাণ করে যে, একসময় যে লেখককুলের সঙ্গে তিনি এমন অন্তরঙ্গ হয়ে জড়িয়ে ছিলেন, আসলে তাঁরাই জড়িত হয়ে মিলেছিলেন এসে তাঁর চারপাশে।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের যে ইতিহাস, সাধারণভাবে পর্যালোচনা করে দেখা গেলো, তার প্রত্যেক যুগেই এক-একজন বিশেষ প্রতিভাবান সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো এক-একটি সাহিত্যচক্র, সাময়িককালের সাহিত্য-আন্দোলন তাই বিশেষ পথে এগিয়ে যেতে

পেরেছে অত্যন্ত সহজে, অচল অবস্থার সৃষ্টি করে তাই অনর্থক কোথাও আটকে থাকতে পারেনি এ-ধারা। এ-বিশ্লেষণীপন্থায় আজকের দিনের বাংলাসাহিত্যের দিকে যদি তাকানো যায়, তা হ'লে অবশ্যই তার প্রকৃত রূপটির সন্ধান পাওয়া যাবে, কিন্তু তা বিশদ আলোচনা-সাপেক্ষ।

দুঃসময়ের সাহিত্য

সাহিত্যের নামে যা-হোক-কিছু রচনা করা কঠিন কথা নয়, সৎসাহিত্য বলে আখ্যায়িত হতে পারে এমন কিছু সৃষ্টি করাই দুঃসাধ্য। বাংলাদেশে সাহিত্যসৃষ্টি হয়, এমন কি সৎসাহিত্য ভারতবর্ষের মধ্যে এক বাংলাদেশেই রচিত হয়েছে। সেটা প্রায় অতীত কালের কথা; আজ বাংলাদেশে সাহিত্যই রচিত হচ্ছে, কিন্তু তা আর সৎসাহিত্য হয়ে উঠছে না। শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তা যে আর কোনো দেশে নেই তা বলবো না, কিন্তু কে-না স্বীকার করবে যে বাংলাদেশ এই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুগাতীত কাল থেকেই আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে আস্‌ছে!

সে ঐতিহ্য আছে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রতি প্রাণময় আকর্ষণ হয়তো কিছু কিছু আছে, কিন্তু তবুও আজ আর বাংলাসাহিত্য তার চির-প্রবহমান গৌরবধারাকে বজায় রাখতে পারছে না। কেন? হয়তো তার জন্য বর্তমান কালটাকেই দোষ দেওয়া যায়, হয়তো বলা যায়, দ্বিখণ্ডিত বাংলাদেশ সম্প্রতি যে বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, প্রাণধারণের আকুল কামনায় শুধু দিনযাপনের গ্লানি নিয়ে কোনোমতে কায়ক্লেশে কালাতিপাত করে চল্‌তে বাধ্য হচ্ছে, সে ভয়াবহতার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আর যার কথাই মনে করা যাক না, অন্তত সংস্কৃতিরক্ষার মতো অবাস্তব কিছুর কথা মনে করা যেতে পারে না। হয়তো এইজন্যেই কেউ কেউ বল্‌তে চাইছেন, আজ আর বিশুদ্ধ সংস্কৃতি-সাধনার সময় নয়, যে দুর্যোগ সাধারণ জীবনে মৃত্যুর বিভীষিকা

এনেছে তাকে রোধ করতে হবে। সাহিত্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরও আওয়াজ তাই ভেসে আসছে সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু এতো হলো সাধারণ মানুষের স্থূল চেতনার কথা—যারা আর কিছু জানে না, কেবলই জানে কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনটাই জীবনের চরম সার্থক বস্তু। অবশ্য স্বীকার করি, সংখ্যাগণনায় এরাই ভারী দিকটা পূরণ করে; কিন্তু তা কি চিরকালের, সকল দেশের, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয়? শোষণের পেষণের অত্যাচার অনাচারের স্রোত কি মানব-সভ্যতার অঙ্গাঙ্গী নয়? কবে কোন যুগে এ-অত্যাচারের বাধভাঙা স্রোতে ভেসে গেছে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি? যেতে পারে না বলেই যায়নি। তাহ'লে আজ কেমন করে বল্‌বো, কেনই বা স্বীকার করবো, শুধুমাত্র সাময়িক বিপর্যয়ের ফলেই বাংলাসাহিত্যের ধারা আজ এমন দুরপণেয় সংকটের মুখামুখী এসে দাঁড়িয়েছে?

আমার তো মনে হয় সাহিত্যের পক্ষে যতটা না দুঃসময় আজ এসেছে বাংলাদেশে, আসলে তার চাইতে বেশী করে তার সংবাদটাই প্রচারিত হচ্ছে পল্লবিত হয়ে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাত্রায়। সে প্রমাণ আজকের দিনের সাহিত্য থেকেই উল্লেখ করে দেখানো যেতে পারে। যাঁরা সত্যিকারের সাহিত্যরসিক তাঁদের কি বলে দেওয়ার দরকার আছে যে, প্রচারাত্মক এই ডামাডোলের বাইরে থেকে এখনও দু' একজন সাহিত্যিক তাঁদের সৃষ্টিকর্মে মনোনিবেশ করে আছেন এবং শুধুমাত্র সাহিত্যসৃজন নয়, তার চাইতেও যা বড় কথা, সৎসাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন? অথচ পাশাপাশি অন্য দিকের চেহারাটা দেখতে গেলে বাংলাসাহিত্যের কুরূপের দিকটারই মুখোমুখী এসে দাঁড়াতে হয়। অর্থাৎ যাঁরা সময়ের দোহাই দিতে চাইছেন, তাঁরাই বাস্তবিকপক্ষে অন্ধ জড়তায় আটকে গিয়ে একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছেন, প্রগতির নামে প্রাণপণ চীৎকারই শুধু সার, আসলে সাহিত্যকে তাঁরাই আর এগিয়ে

নিয়ে যেতে পারছেন না। শুধু তাই নয়, যাঁরা সত্যিই সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, চান প্রবহমানতায় সঞ্জীবিত বাংলাসাহিত্য আজও সামনের দিকেই এগিয়ে চলুক, তাঁদেরও তাঁরা সাহায্য করতে সম্মত নন। অথচ, অভিমানের শেষ নেই। আত্মপ্রচারের জয়ডঙ্কায়ও যদি কাজ না হয়, তা হলে মোক্ষম অস্ত্রটির ব্যবহার করতেও তাঁরা দ্বিধান্বিত নন! ভালোমানুষের মতো সহজেই নতিস্বীকার করে যে আসতে চাইবে না তাঁদের দলে, ধর্মভীরুর শেষ সম্বল যেমন ধর্মের দোহাই দেওয়া, ঠিক তেমনি তাঁরা তাদের প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করবেন। বস্তুত এইখানেই তাঁদের জিৎ। প্রগতির নামে যুবজনসমাজকে যত তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করা যায়, তেমন আর কিছুতেই নয়। তাই আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি, শুধুমাত্র প্রগতিবাদী হওয়ার প্রবল আকর্ষণেই তরুণতম সাহিত্যিককুল এই ডঙ্কানিনাদের সঙ্গে নির্বিবাদে কণ্ঠ মিলিয়ে চলতে লজ্জাবোধ করছে না। তা ছাড়া, প্রচারেরও অপূর্ব মাহাত্ম্য। এদেরই মধ্যে দলে দলে সাহিত্যিক শিল্পীর জন্ম হচ্ছে প্রতিদিন, এবং জানা যাচ্ছে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই নাকি প্রতিশ্রুতিবান লেখক। এ প্রচার যতদিন চল্‌বে, ততদিন যে দল ভারী হতে থাকবেই তাতে আর বিচিত্র কি!

কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, এত ঘন ঘন এমন দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিকের জন্ম হচ্ছে কেমন করে। অথচ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, যাঁদের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র হাতে নিয়ে এই সব সাহিত্যিক আসরে নেমে পালা গান করতে সাহসী হচ্ছে, তাঁরাই আবার সরবে প্রচার করছেন, আজ সাহিত্যের সঙ্কট মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেচে—যে অচলায়তন সাহিত্যরীতিতে আমরা এতদিন মুগ্ধ হয়ে থেকেছি, তা বাস্তব জীবনের প্রতীক নয় অতএব পরিত্যাজ্য, অতএব নতুন করে নতুন পথের সন্ধান নিতে হবে। কথাটা সত্য বলে মানতে না হয় রাজী আছি, এ কথাও স্বীকার করবো যে নতুন পথের সন্ধান করবে যে, সে দুঃসাহসিক

অগ্রপথিক চাই। কিন্তু তাই বলে এ-কথা কেমন করে মেনে নেওয়া যায়, যে দুঃসাহসিকের দল এ-পথে এসে পা দিচ্ছে তারা সবাই এতই করিৎকর্মা সিদ্ধপুরুষ যে সামান্য সাধনা না করেও অতি অনায়াসে সার্থকতার চরমে গিয়ে পৌঁছতে পারছে। এখানেই সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। এ-উচ্চরবে যাঁরা সহজে বিচলিত হন না অথচ তার সার্থকতা সম্বন্ধেও উৎসুক, স্থিতধী হয়ে এখানেই তাঁদের একটা কথা একান্ত নিভৃতে ভেবে নিতে হচ্ছে, সমগ্র জীবনের সাধনার পরিবর্তে যাঁরা সাহিত্যের একটা বিশেষ রূপ আবিষ্কার করলেন তাঁরা কি তবে ভুল পথেই অন্ধের মতো ঘোরাফেরা করলেন, আর যাঁরা 'ইউরেকা' বলে চীৎকার করে সরবে জয়ঘোষণা করছে, তাঁরা ঐতিহ্যহীন পথে পা দিয়েই একান্ত অনায়াসে সার্থক হয়ে উঠ্‌তে পারলেন? যাঁদের মনে এ-জিজ্ঞাসা একবার উদিত হবে, তাঁরা ত এ-কথাও একবার নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন, কার্যত যা হচ্ছে, তার সঙ্গে সংক্রান্তিকালীন দুর্যোগের নির্দেশদাতাদের উক্তির সঙ্গতি আছে কিনা। আর আমার মনে হয়, এ-দুয়ের মধ্যে সুসঙ্গত মিলনের আভাস কোথাও নেই। প্রথমত, যাঁরা বল্‌ছেন বাংলাসাহিত্য আজ সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন তাঁরা বিশেষ করে বর্তমানের দুঃসময়ের কথাই উল্লেখ করছেন। দ্বিতীয়ত, যাঁরা তাঁদের নির্দেশানুসারে সাহিত্য-পথ-পরিক্রমায় ব্রতী হয়েছেন তাঁরা আসলে সাহিত্যসৃজনে নিষ্ঠাবান প্রয়াসী নন, বস্তুত এই তথাকথিত দুঃসময়কে মূলধন করেই যে যা-হোক-একটা কিছু রচনা করছে তা স্পষ্টপ্রত্যক্ষ। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই ঘটনায় সামঞ্জস্য হয়তো লক্ষিত হতে পারে, কিন্তু নিঃসন্দেহেই বলা যায়, শেষোক্ত পথের যাঁরা পথিক তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টিতে যতটা ফাঁকির সন্ধানী, প্রকৃত আদর্শের প্রতি ততটা নিষ্ঠাবান নন। অতএব, প্রচারের কল্যাণে আজ যে সাহিত্য প্রগতিমূলক বলে তরুণ সাহিত্যিক দলের কাছে অভিনন্দিত হচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে সৎসাহিত্য নয়, বড় জোড় বলা যায় নবতন পথ-

সন্ধানের প্রচেষ্টা মাত্র। তাই যদি হয়, তা হলে আমারও তা মেনে নিতে আপত্তি নেই, কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাটাও বল্‌তে চাই যে, প্রয়াসটা যতদিন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে, ততদিন তাকে সোৎসাহ কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেই দেখা যাক না; যদি একদিন তার প্রয়াস সার্থক হয়ে ওঠে, তখন তাকে তো বাঙালী পাঠকসাধারণ এবং আগামী যুগের সাহিত্যিককুল অবশ্যই গ্রহণ করবেন। প্রচার-যন্ত্রটা'কে ততদিন বন্ধ করে রাখলে এমন কি ক্ষতি। কিন্তু এ প্রচারযন্ত্র যদি প্রতিনিয়ত এমনিধারা কর্তব্যরত থাকে, তা'হলে একটা ভয়ানক ক্ষতি এই হবে যে, সাহিত্যের সত্য পথ যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে সে দুঃসংবাদ একান্তভাবেই গোপন হয়ে থাকবে, হয়তো এ-ভুল পথই দিনদিন প্রশস্ততর হতে থাকবে। তারপর একদিন যখন সাহিত্য-স্রষ্টাদের চোখের সামনে থেকে ভ্রান্তির কুয়াশা অপসারিত হবে, সেদিন অনুতাপের আর সীমা পরিসীমা থাকবে না, বাংলা-সাহিত্যের পক্ষে সত্যিকার দুঃসময় ঘনাবে তখনই।

দ্বিখণ্ডিত বাংলা নয়, শোষণ পেষণের সংবাদটাও সব নয়, বাংলা-সাহিত্যের পক্ষে যে দুঃসময় আজ প্রত্যক্ষগোচর, তার জন্য তারা আংশিক দায়ী মাত্র। যে স্থূল চেতনার কথা আগে আমি উল্লেখ করেছি, বস্তুত তাই হচ্ছে এর জন্য দায়ভাগী। দ্বিখণ্ডিত বাংলার সংস্কৃতি স্পষ্ট করে এখনও দ্বিখণ্ডিত হয়নি, শোষণ-পেষণ এবং উর্ধ্বতন সমাজের অত্যাচার অনাচার আজকেই হঠাৎ নেমে আসেনি নিচুতলার সমাজের ওপর। আসল কারণ, রূঢ় শোনালেও বলতে হবে, প্রগতিশীল হওয়ার উৎসাহ-প্লাবন ছাড়া এ আর কিছু নয়। সে প্লাবনধারায় ভেসে গেছে সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তর-প্রেরণা, ভরাডুবি হয়েছে সাহিত্যিক নিষ্ঠার। সুখদুঃখ-ব্যথাবেদনা-আশা-আকাঙ্ক্ষা আর হৃদয়-গ্রাহ্য সকল প্রকার অনুভূতিকে নিয়েই মানুষের জীবন, উপরতলার অত্যাচারে বেদনাহত মানুষের ব্যথাবোধটাই সব কথা নয়। সাহিত্যের কারবার গোটা মানুষকে

নিয়ে, তার সমগ্র সমাজকে নিয়ে, খণ্ডাংশকে নিয়ে নয়। আজ যদি কেউ খণ্ডিত দৃষ্টি নিয়ে এই একটা অংশকে বিশেষ করে দেখে, আর তাই দেখেই বলে, এই নিষ্পেষণের কাহিনীটাই মানবজীবনের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা, এবং যেহেতু সাহিত্য এই মানুষেরই কাহিনী, সুতরাং এই কাহিনী কথাকেই রূপায়িত করতে হবে সাহিত্যের পাতায়, তা হলে কেমন করে স্বীকার করবো যে, তিনি মানবজীবনের সবটাই দেখেছেন। যা তিনি দেখলেন না কিংবা যাকে তিনি ইচ্ছে করেই অগ্রাহ্য করলেন তার মূল্যও তো কিছু কম নয়! আর যে হৃদয়বান সাহিত্যিক মানুষের জীবনের সমস্ত অনুভূতিকে, তার সমস্ত চেতনাকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করলেন, তা সমগ্র দৃষ্টির দান বলে কি প্রতিক্রিয়াশীলতায় পর্যবসিত হবে? বল্‌তে কুণ্ঠিত হবো না, অন্তর্লোকে পৌঁছবার ক্ষমতা যায় নেই, বাইরের স্থূল আবরণের নিখুঁৎ ছবি আঁকলেও তাঁকে শিল্পী বলে অভিনন্দন জানানো সম্ভব নয়। খণ্ডাংশকে সমগ্রতার সম্মান দেওয়ার ফলেই আজ সাহিত্যের সত্যকার আদর্শ সিংহাসনচ্যুত হয়েছে, সন্দেহ কি? তাই অবশেষে বল্‌তে বাধা নেই, উন্মাদনার মোহে আচ্ছন্ন সাহিত্যিককুল যদি নিবিষ্ট মনে এই সাধারণ কথাটা বুঝতে না চান যে, মানবজীবনের স্থূল এবং খণ্ডিত সত্তার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মমতা দেখানো সাহিত্যিকের পক্ষে একমাত্র আদর্শ নয়, তা'হলে স্বপক্ষ থেকে যতই কেন না প্রচারযন্ত্র তাঁদের অভিনন্দন জানাক, দুঃসময় ঘুচ্‌বে না—উন্নততর সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া তো অসম্ভব!

বাংলাসাহিত্যের অধঃপতন

বাংলাসাহিত্য রসাতলে গেলো, সংক্রামক ব্যাধির বীজাণুর মত দ্রুতগতি এই সংবাদটা এমনভাবে আজ প্রচারিত হয়ে গেছে যে, সাহিত্যিক, কুসাহিত্যিক এমনকি নিতান্ত অসাহিত্যিকের দলও পরম নির্বিকারচিত্তে এই অধঃপতনের কথাটা উচ্চারণ করতে দ্বিধাবোধ করছে না। যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়, অথচ একটা সংস্কৃতিপরায়ণ দেশ ও জাতির পক্ষে এটা যে কতবড় সর্বনাশের কথা তা কল্পনা করাও কষ্টকর। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, সত্যিকার কারণ অনুসন্ধান না করে চতুর্দিকে একটা ধিক্কার রবে আকাশ-বাতাস ছেয়ে দেওয়াই এ-মুহূর্তের ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এই হয়েছে যে, সত্যিকার সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসটাকে ক্ষণকালের জন্য মুলতুবী রেখে সবাই উঠে-পড়ে লেগে গেছেন অশ্রাব্য বাক্যে সাহিত্যের নামে গালাগালির কাদামাটি ছুঁড়তে। একথা কি বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, এ-কাজটা সাহিত্য-সুলভ নয়, যাঁরা একাজ করছেন, তাঁরা আদৌ সাহিত্যিক নন। সৃষ্টিকর্মই যাঁদের ধর্ম, ভূতের নাচ নাচবার দায়িত্ব তাঁদের নয়। অন্য কারো।

এই অন্য কারা বাংলাসাহিত্যের অধঃপতনের জন্য দায়ী? উল্টো দিক থেকে দেখতে গেলে, আমার তো মনে হয়, সাহিত্যপাঠকমাত্রেরই আজ উৎসাহিত উৎফুল্ল হওয়ার কথা। ষ্টলে ষ্টলে নিত্য নতুন পত্রপত্রিকার সমাবেশ, কাগজের চড়া দামকে অগ্রাহ্য করে প্রতিমাসে প্রচারিত নতুন নতুন বই-এর প্রকাশসংবাদ, কে বলবে, সাহিত্যের

অধঃপতনকেই প্রচার করে! কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের কথা এত করেও এ দুর্নামের বাঁধভাঙ্গা জোয়ারকে রোধ করা যাচ্ছে না।

আর তার চাইতেও লজ্জার কথা এ দুর্নাম রটিয়ে বেড়াচ্ছেন এইসব নব-নব পত্রিকার জন্মদাতারাই। প্রথাটা অভিনব। বিভিন্ন প্রতিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর সমালোচনার নামে কাদা ছোঁড়াটাই তাঁদের সাহিত্যকর্ম। সমবেত এ গাজনগানের যে কি অদ্ভুত রূপ আজ হয়েছে, যে-কোনো পত্রিকার পাতা ওল্‌টালেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাঁদের অধিকাংশই সাহিত্যের আলোচনাকেও অতিক্রম করে সাহিত্য-শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের অন্দরমহল পর্যন্ত ধাওয়া করতে পিছপা নন। এই করে যদি তাঁরা প্রচার করতে চান, বাংলাসাহিত্য রসাতলে গেলো, তা হলে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, তাঁরা কোন্ সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন?

তবু যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে তাঁদের কথাই সত্যি, অর্থাৎ বাংলাসাহিত্য আজ অধঃপতনের পথে নেমে চলেছে, তা হলেও তার কারণ উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। এবং তা যদি অসম্ভব কিছু না হয়, তবে বিস্ময়করভাবে দেখা যাবে, যুদ্ধোত্তরকালের সাহিত্যসৃষ্টির অত্যুৎসাহই এই বিপর্যয়ের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। প্রথমত, এই সময়টাতে এত পত্রিকা বাংলাদেশের সাহিত্যের বাজারে ভিড় করেছে যে, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসেই বোধ হয় এরকম ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটে নি। দ্বিতীয়ত, প্রথমোক্ত কারণেরই অনিবার্য ফলে, সাহিত্য-বুদ্ধিহীন কুলেখক একদল মুখোস-ধারীর জন্ম হয়েছে। তৃতীয়ত, শুধু বাংলা নয়, সমস্ত দেশ আজ রাষ্ট্রনীতির উন্মাদনায় এমনভাবে তন্ময় হয়ে গেছে যে, অনেকটা বাধ্য হয়েই যেন আজকের সাহিত্য তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিষ্কৃতি পেতে চেষ্টা করছে।

বলা বাহুল্য, সংস্কৃতিরক্ষার পক্ষে এর কোনোটাই সুস্বাস্থ্যের পরিচয়

বহন করে না। যুদ্ধোত্তরকালে যে এত পত্রপত্রিকার জন্ম হলো, কিংবা সাহিত্যের প্রতি এত যে আকর্ষণ এ-সময়টায় অনুভূত হলো, সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক, তার পেছনে খুব স্পষ্ট কিছু সদুদ্দেশ্য ছিল কি না। যদি বলা যায়, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির অনিবার্য নিয়মানুসারে যে অর্থসঞ্চয় ঘটেছে সাধারণবুদ্ধি জনসাধাণের পকেটে, তারই একটা নির্গমন পথের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এই সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা। আসলে, আগাগোড়াই ব্যবসাবুদ্ধির মমতাহীন প্ররোচনায় একদল অসাহিত্যিক সাহিত্যক্ষেত্রকে কলুষিত করবার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো। এবং এইজন্যেই দেখা গেলো, অনেক পত্রিকা প্রায় জন্মলগ্নেই নিঝুম হয়ে ঢলে পড়েছে; কারণ, সাহিত্য বস্তুটি বাংলাদেশে এমন কিছু পণ্য নয়, যে টাকার বিনিময়ে অধিকসংখ্যক টাকাই সে তৈরী করে চলবে। ফলে, তারা আর কিছু দিতে পারুক আর নাই পারুক, সাহিত্যপথের সর্বনাশকে নির্বিঘ্নে এগিয়ে আসতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছে। কারণটা বলি।

ব্যবসায় মার খেয়ে যে-সব পত্রিকা ঝরে পড়ার তারা তো গেলই; কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে যেমন একসঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিলো, তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে তারা আর একসঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করলো না। তা হলে সাহিত্যের আসরে আর ভূতের নাচ নাচবে কে। এই নাচ দেখানোর, জন্যেই থেকে গেলো কিছু সাপ্তাহিক মাসিক পত্রপত্রিকা। সৎসাহিত্য-সৃষ্টির দায়-দায়িত্ব যখন রইলো না, তখন আর চিন্তা কি; সুসাহিত্যিকের রচনা না হলেও চলবে, নিজেরাই বা কম কি? ফলে এই হলো যে গল্প কবিতা প্রবন্ধের নামে যে যা-কিছু অর্থহীন শব্দসমন্বয় করে প্রকাশ করতে লাগলো। বাধা দেবে কে, কাগজ যে তাদের নিজেদের হাতে! কিন্তু তাতেই তো সব হয়ে গেলো না; দুর্বলতাটাকেও আবরণ দেওয়া প্রয়োজন যে। নিজেদের রচনায় উৎকর্ষসাধনের কোনো উপায়ই যখন আর নেই, তখন কাপুরুষদের পক্ষে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করার

একমাত্র পথ হলো অন্যকে গালাগাল দেওয়া। তাতে সার্থসিদ্ধি যেমন হয়, সহজ হাততালি যেমন পাওয়া যায়, আত্মতৃপ্তিও তেমনি সহজপ্রাপ্য। ঐতিহ্যের বালাই নেই, থাকার কথাও নয়: বানে ভেসে এসেছে কাদা মাটি, শক্ত ভিত্তির গায়ে তারা তাই অটুট হয়ে লেগে থাকতে পারে না। তাই, ঐতিহ্যের প্রতি মোহও তাদের বিন্দুমাত্র নেই। এবং এইজন্যই পরম নির্বিকারভাবে হাস্তে হাস্তে তারা পারে পূর্বাচার্যদের কীর্তিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে, পারে সমসাময়িক সৎসাহিত্যসৃষ্টি-প্রয়াসকে ইতরের ভাষায় ঠাট্টা করতে!

আরও একটা দিক আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী আলোড়নের ফলে যে উত্থানপতন ঘটেছে রাষ্ট্রতন্ত্রে, তার অন্যতম দায়ভাগী ভারতবর্ষও। অতএব রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন এখানেও প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয়। নতুন করে সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে, দেখা গেল, কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন যে, যেহেতু সাহিত্যের আশ্রয় পারিপার্শ্বিক সমাজজীবন, তখন সাম্প্রতিককালের এই রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনধারাও অবশ্যই স্বাক্ষরিত হবে আজকের দিনের সাহিত্যে। বাংলাসাহিত্যে তার নিদর্শনও মিলছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদও সাহিত্য নয়। যে কথাটা বলবার জন্য প্রবন্ধ-রচনাই উপযুক্ত বাহন, ঠিক সে কথাটাই নির্বিঘ্নে বলা হচ্ছে কবিতায়ও। তাতে আর যাই হোক সৃষ্টিকার্য সমাধা হয়না। অবশ্য, প্রচারমূলক সাহিত্যের দাবী যদি সীমাবদ্ধ থাকে ক্ষতি নেই; কিন্তু যদি দাবী জানানো হয়, সাহিত্য একেবারেই জনগণের মুক্তিকামনার বাণীরূপ, অতএব সাহিত্যিককে নেমে আসতে হবে জনতার পাশে, তা হলে সত্যিই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত না হয়ে উপায় থাকে না। সংস্কার-মুক্তির অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন না হয়ে একথা কেউ উচ্চারণ করতে পারে তা ভাবতেও যেন অসম্ভব মনে হয়। তবু ভালো, এ-প্রচারকার্য তাঁরা আপন কক্ষপথে ঘুরে ঘুরেই চালিয়ে যাচ্ছেন, উদ্দেশ্যহীন অক্ষম

সাহিত্যযশলিপ্সুদের মতো পরছিদ্রান্বেষী তাঁরা তেমন নন। তবু একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে বোধ হয়, রাষ্ট্রনীতির অন্ধ মোহে যাঁরা সত্যিকার সাহিত্যপথের ওপর মতবাদের রথ চালিয়ে নিয়ে যেতে চান, তাঁরা একদিকে যেমন ভুল পথে এগোচ্ছেন, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যকেও কলুষিত করে তুলছেন।

বাংলাসাহিত্য রসাতলে গেলো বলে আজ যাঁরা আতঙ্কিত হয়ে চোখ বুঁজতে চাইছেন, তাঁরা, বস্তুর তার এই কয়টি রূপের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছেন বিশেষ করে। বলে রাখা ভালো, এর কোনটাই বাংলা-সাহিত্যধারার প্রকৃত রূপ নয়—ঐতিহ্যগত যে ধারা শতাব্দীব্যাপী প্রবাহিত হয়ে এসেছে এ দেশে। সাহিত্য-আলোচনার নামে গালাগাল আদানপ্রদান করার রেওয়াজ যে বাংলাদেশে ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি এমন কথা বলবো না। মধুসূদনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্য-আলোচনার নামে এ-গালাগাল সবসময়ই চলে এসেছে। কিন্তু আজকের মত তার রূপ বোধ হয় এমন কদর্য আর ব্যাপক কখনও হয়নি। তবু আমাদের ভরসা এই, সাহিত্যের আসরে এই তাণ্ডবলীলা আগেও যেমন টেঁকেনি, এখনও তেমনি টিঁকবে না। ছুছুন্দরীবধ কাব্য যতই কেননা রচিত হোক, মেঘনাদবধ যদি সত্যিই রচিত হয় তবে তার আলো অম্লান থাকবেই। আজকের দিনের সাহিত্যরসপিপাসু পাঠক-জনের কাছে এই সান্ত্বনাবাক্যই আমরা পৌঁছে দিতে পারি!

সাহিত্যের মান

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে, পরিপার্শ্ব-সচেতন মানবজীবনের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে যদি গড়ে ওঠে সাহিত্যের স্বরূপ, তা' হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, যে-সাহিত্য এ দু'টি বিভিন্ন রূপের প্রকাশে হবে সার্থক, তাকে সৎসাহিত্য বলে আখ্যায়িত করা উচিত। অর্থাৎ, সাধারণ-ভাবে বলা চলতে পারে যে, বৃহত্তর সমাজজীবনে যারা সর্বাঙ্গীণ বলে পরিচিত তাদের হৃদয়ের কথা প্রকাশ করবেন যে-সাহিত্যিক যত সার্থকতায়, সৎসাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁরই কৃতিত্ব হবে তত বেশী। তাতে একটা কথা খুব সহজভাবেই অনুমান করা যেতে পারে, ব্যাপকতর মানবসমাজের কাছে যে-রচনা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী বলে গণ্য হবে, সাহিত্যের মাননির্ণয়ে তারই স্থান হবে উচ্চে।

কিন্তু সাহিত্যের মাননির্ণয়ের আগে রসরসিকসম্প্রদায়ের সাহিত্য-বুদ্ধির মাননির্ণয় করা প্রয়োজন। আপাতবিচারে দেখা যাবে, সব দেশে না হোক, অন্তত আমাদের দেশে, মোটামাটি শিক্ষিত সমাজ যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে তারা স্পষ্ট দুইটি স্তরে বিভক্ত—একদল উচ্চবিত্ত, দ্বিতীয় দল মধ্যবিত্ত। প্রথমোক্ত সমাজ নির্বিচারে ধনী নামধেয় ; শেষোক্ত যাঁরা, তাঁরা ধনী নয়, কিন্তু সাধারণভাবে, দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের অন্বেষণে ঘর্মাক্ত-কলেবর হলেও ব্যর্থ নয়। আরও একটা দলের নাম এসঙ্গে উচ্চারণ করা হয়তো চলে, কিন্তু সমাজের একটা বড় অংশ দখল করে থাকলেও প্রকৃত শিক্ষা থেকে এখনও তারা এতখানি বঞ্চিত যে, তাদের মনে বোধ হয় কখনও সামান্যমাত্রও সাহিত্য-জিজ্ঞাসা উঁকিঝুঁকি দেয় না—তারা নিম্নবিত্ত, সাধারণ সংজ্ঞায় আজ

যাদের সোজাসুজি বলা হয় শ্রমসর্বস্ব। তা হলে দেখা যাচ্ছে, বিশেষত উচ্চ আর মধ্যবিত্ত সমাজজীবীরাই সাহিত্যের পাঠক। কিন্তু তাই কি সত্যি? আমাদের দেশে যারা ধনীসম্প্রদায় বলে পরিচিত, আজো, যখন পৃথিবীর সর্বদিকপ্রান্ত প্রায় হাতের নাগালের মধ্যেই আয়ত্তাধীন, তাঁরা কি যথাযোগ্য সাহিত্যজিজ্ঞাসায় উন্মুখ? প্রমথ চৌধুরী যখন স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন, আমাদের দেশের বড়লোকেরা হাজার টাকার নোট বাঁধিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবেন তবু বই কিনবেন না, তখন সে-উক্তি যত সত্য ছিল, আজ যদি কেউ ঠিক এই কথাটিই তেমনি ভাবে উচ্চারণ করেন, তা হলে কি তিনি ঠিক ততখানিই সত্য উক্তি করবেন না? গত বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণ-আশীর্বাদে দেশদেশান্তরের আচার-বিচার প্রায় ঘরোয়া রূপ নিতে বসেছে, উচ্চবিত্তমহলে টাকাপয়সার লেনদেনও প্রায় সীমা-অতিক্রান্ত, তথাপি কি খুব সহজে আর সানন্দে এ-কথা স্বীকার করা সম্ভব যে, যাদের কাছ থেকে সাহিত্য আজ নির্বিঘ্ন সমর্থন আশা করে, তারা আছে তার প্রতি উন্মুখ চেতনায় তাকিয়ে! সম্ভব নয়। কিন্তু এই ধনিক-সম্প্রদায়কে কে বলবে অশিক্ষিত, সংস্কৃতি-জ্ঞানহীন, ব্যবসাবুদ্ধিসর্বস্ব সামাজিক জীব মাত্র! বরং তার উল্টোটাই দেখা যাবে, এই ধনিক শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, কথায়-বার্তায় চালে-চলনে মার্জিত রুচির ফুলঝুরি তারা। তারা গাড়ী চড়ে, সিনেমা হলের উঁচু দামের সীটে বসে সরবে হাসে। প্রমথ চৌধুরী যাদের বিদ্রূপ করেছিলেন, সে অভিজাত মহাজন সমাজ আজ অধঃ-পতিত, কিন্তু তার বদলে এখন যারা অর্থের আনুকুল্য পেয়ে সমাজ-জীবনে ফুলেফেঁপে উঠেছে, তাদের মধ্যে তো খুব বেশী তফাৎ দেখা যাচ্ছে না। যা একটু প্রভেদ তা এই যে, এরা হয়তো হাজার টাকার নোট টাঙাতে চায় না, ঘর-বাড়ী সাজিয়ে রাখে নবতন ডিজাইনের চেয়ার-টেবিল আর রেডিও-টি. ভি. সেটে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু নিতান্তই নগণ্যসংখ্যক বলে তা পরিত্যজ্য। তারপর আসে

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা। বর্তমান যুগের সমাজব্যবস্থার অভিশাপে জর্জরিত তারা, সারা গায়ে শুধু দিনেযাপনের গ্লানি মেখে কলঙ্কিত করে চলেছে তারা তাদের সমাজদেহ, ব্যক্তিসত্তা। অথচ অন্য কোনো উপায় নেই। একদিকে উর্ধ্বতনের অবহেলা উৎপীড়ন, অন্যদিকে নিঃস্বতার প্রবল আকর্ষণ। তারও পরে আছে, মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ বলে আত্মতোষণের অন্তিম পরিহাস। ফলে, যে বিশৃঙ্খলা আজ চরম রূপে দেখা দিয়েছে এই মধ্যবিত্ত সমাজজীবনে, তাকে অস্বীকার করবার উপায় তো নেই-ই, এই দুরবস্থা থেকে তাকে বাঁচানোও প্রায় অসম্ভব। অথচ, সব চাইতে দুঃখের কথা, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষগুলিই দেশের প্রকৃত গৌরবের বস্তু—তারাই বস্তুত শিক্ষিত, মননধর্মে উন্নত রুচিত পরিবাহক। সুতরাং এ-কথাটা নিশ্চয়ই সত্য বলে স্বীকৃত হবে যে, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বল্‌তে আমরা যা-ই বুঝি, তার জন্ম এবং প্রচার যদি একান্ত কাম্য হয় কোনো দেশের পক্ষে, তা হলে ব্যাপকভাবে তা হবে এই মধ্যবিত্ত সমাজটির জন্যই! প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের পাঠক এরাই। তবু তাদের অধিকাংশ অক্ষম, দিনগত পাপক্ষয়ের মৃত্যুতপস্যায়-মগ্ন তারা আজ।

তথাপি সাহিত্যকে বেঁচে থাক্‌তে হয়, এগিয়ে চল্‌তে হয়। তাই এত দুঃখ সয়েও তার নাভিশ্বাস ওঠে না। আর সব চাইতে ভরসার কথা সাহিত্যকে আজও বাঁচিয়ে রাখছে এই নিঃস্বপ্রায় মধ্যবিত্ত সমাজই। সুতরাং এখানেই ওঠে সাহিত্যের মাননির্ণয়ের প্রশ্ন। কতভাবেই তো একটা কথার পুনরুক্তি ঘটেছে—সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সাহিত্যে চিরন্তনতার প্রশ্ন যদি ওঠে তা হলে এ-কথাটা যে কতখানি খাঁটি বলে প্রমাণিত হবে তা বিচারসাপেক্ষ, তবু, নিতান্তই সাময়িক কালে এ-কথাটাকে তো স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে, সাহিত্যের যারা সাধারণ পাঠক তাদেরই হৃদয়ের কথা, দুঃখবেদনার কাহিনী, সর্বোপরি তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হবে যে রচনার মাধ্যমে তা-ই হবে সাম্প্রতিককালের বিচারে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য—ভবিষ্যৎ ভাগ্য তার যাই

হোক না, সাময়িককালের জয়টীকা আঁকা হবে তারই ললাটে। ফলিত সাহিত্য নিয়ে যাঁদের কারবার এটা বড় কম লোভ নয় তাদের কাছে। তাই দেখতে পাচ্ছি, সাহিত্যের আসরে আজ একদিকে বসে আছে ছিঁচকাঁদুনে রোমান্টিসিজম্ আর একদিকে কাপালিক রিয়ালিজম্। ফলে সাধারণভাবে তারা উভয় দলই প্রচুর হাততলি পেয়ে যাচ্ছে সত্য কিন্তু সাহিতের স্বরূপটিই যেন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

ব্যক্তিগতভাবে কোনো সাহিত্যিকের ওপর যে চাটুকারবৃত্তির অপরাধ কখনও আরোপিত হয়নি তা নয় তবু সত্যি যে সাহিত্য কখনও কারো নেকনজরের প্রশ্রয় খোঁজে না। আপন মহিমায় সে আপনি প্রতিষ্ঠিত। সাময়িক কালের এই বিশৃঙ্খল দুরবস্থা সাহিত্যের পাতায় একেবারেই স্থান পেতে পারে না এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু তাকেই যদি চরম মূল্য দেওয়ার মতো ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন কেউ তা হলে সেটা তাঁর সাহিত্যকর্মের পক্ষে লজ্জাকর ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয় বলেই আমি মনে করবো। সহজ বাহাদুরী পাওয়া কষ্টকর নয় তার প্রমাণ আছে আমাদের বাংলাসাহিত্যেই। মানুষের মনের স্বভাব-কোমল হৃদয়বৃত্তিকে সজোরে নাড়া দিয়ে বাহবা পেয়ে নগদ মূল্য আদায় করে নিয়েছিলেন একাধিক রচনাকার কিন্তু নতুন করে বিচার করে দেখা গেলো তাদের প্রায় সকলেরই আসন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। অথচ জনপ্রিয়তায় তাঁরা একসময়ে সিংহাসনেরই তো দাবিদার ছিলেন!

কেবলমাত্র সাহিত্যিকসম্প্রদায়ের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলেই অন্যায়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। সাহিত্যের সঙ্গে আরো একটা মহলের যে যোগ আছে, বস্তুত যাদের নিয়ে সাহিত্য গড়ে ওঠে, বেঁচে থাকে, সেই পাঠকসম্প্রদায়েরও দায়িত্ব কিছু কম নয়। আত্মসচেতন অথচ সাহিত্যসচেতন নয়, শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে এ বিসদৃশ আচরণ আশ্চর্যজনক এবং সে-কথা ভাবাও কষ্টকর। যে

ধনিক শ্রেণীর ওপর একটা দেশের উন্নতির অনেকখানি নির্ভর করে, শিল্পসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হওয়া যার সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত, দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যের প্রতি তারাই আজ সবচেয়ে বেশী উদাসীন। যদি তারা অশিক্ষিত হতো, কেবলই মাত্র ব্যবসাবুদ্ধিসর্বস্ব হতো, তা হলে হয়তো তেমন দুঃখ ছিল না, কিন্তু লজ্জার সঙ্গেই লক্ষ্য করতে হচ্ছে, শিক্ষার গর্ব তারা করে, সংস্কৃতিবোধের বড়াই করতেও কুণ্ঠিত নয়। এই যে আত্মপ্রতারণা তা তাদের সমাজের পক্ষে যত ক্ষতিকরই হোক, তার চাইতেও তা ঢের বেশী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মধ্যবিত্ত পাঠকশ্রেণীর পক্ষে। মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যে আজ ভাঙন ধরেছে, সে-ভাঙনের স্রোতটা কেবলই নিম্নগামী নয়—এদের মধ্যে একটা দল, যত ছোটই হোক, ধনিক শ্রেণীর সমপর্যায়ভুক্ত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় যত্নবান। এরাও কম সঙ্কটের মুখোমুখী নয়। উঁচুমহলে যাদের বাস, সামগ্রিক সমাজজীবন থেকে তারা করুণভাবেই বঞ্চিত। ফলে, যে প্রাণরসে সিঞ্চিত হয়ে স্বচ্ছন্দ মধ্যবিত্ত জীবন গড়ে উঠেছে এতদিন, তার সন্ধান তারা পায়নি কখনও। সেখানে, তাই আর যাই থাক, অন্তত হৃদয়ের গভীরতার স্পর্শ নেই। আজ যারা এই সমাজের উন্নীত ধনস্ফীতির প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে, কিংবা আত্ম-উন্নয়নের অভীপ্সায় এই সমাজ-জীবনের আদর্শে আস্থাবান, তারা অবধারিতভাবে তার বাইরের সাজসজ্জারই পূজক; হৃদয় যার নেই তার অন্তরঙ্গ হৃদয়চেতনার স্পর্শ পাওয়ার প্রশ্ন তোলা অবান্তর। অন্যদিকে, আপন ক্ষেত্র থেকে উন্মূলিত হয়ে তারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থেকেও বঞ্চিত হতে বাধ্য। প্রত্যক্ষত না হোক, অন্তত পরোক্ষেও এই ধনিক শ্রেণী মধ্যবিত্তসমাজের অনেকখানি ক্ষতিসাধন করেছে সন্দেহ নেই তাতে, শিল্পসাহিত্যের প্রতি ঊর্ধ্বতন মহলের স্বাভাবিক উদাসীনতা অন্তঃস্রোতে সংক্রামিত হয়েছে মধ্যবিত্তেরও মানসক্ষেত্রে।

সাহিত্যের মানকে উন্নত করতে হবে, কিন্তু সে-সঙ্গে পাঠক-

সাধারণের সাহিত্য-বোধকেও উজ্জীবিত করা একান্ত প্রয়োজন। যদি বলি, সাহিত্য সাহিত্যেরই প্রয়োজনে, পাঠকজন এ-ক্ষেত্রে অবান্তরমাত্র, তা হলে তা মিথ্যাই বলা হবে। আর তার চাইতেও মিথ্যা উক্তি হবে যদি বলি, বিপুলা পৃথ্বী এবং নিরবধি কাল, অতএব আজকের এ-মুহূর্তে যদি কোনো সাহিত্য পাঠকশ্রেণীর দৃষ্টির অগোচরে পরে থাকে তা হলেও ক্ষতি নেই, কালের বিচারে একদিন তার প্রকৃত মূল্য নির্ণিত হবেই। কারণ, একদিকে যেমন মানবজীবনের সঙ্গে সমাজব্যবস্থা আজ অঙ্গাঙ্গী হয়ে মিশে গেছে, অন্যদিকে তেমনি সৎসাহিত্যের মূল্যবিচারের অন্তত একটা সাধারণ মানও আমাদের হাতের কাছে উপস্থিত, যার ফলে নিরবধি কালের হাতে সাহিত্যকে ছেড়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং চিরন্তন মূল্যই হোক কি সাময়িক মূল্যই হোক, সমসাময়িক পাঠকসাধারণের কথা ভুলে গেলে চলবে না সাহিত্যিককে; আবার পাঠকজনের সাহিত্যজিজ্ঞাসা যদি সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়ার অবকাশ না পায় তা হলে কেমন করে সাহিত্য তার পথ করে নেবে সামনেব দিকে? সাহিত্যসৃষ্টির মূলে আছে তাই উভয় পক্ষেরই দান—সৃজনক্ষমের সচেতন প্রেরণা আর রসরসিকের নির্বিকল্প গ্রহণ-অভীপ্সা। এ-দুয়ের সামঞ্জস্য যদি না ঘটে, সৎসাহিত্যসৃষ্টির পথ তবে সংকীর্ণ হয়ে যাবেই।

সাহিত্যে অশ্লীলতা

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মোটামুটিভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর মানুষের যদি আর কিছুই করবার না থাকতো, অন্তত তাশ-পাশা আর খেলার মাঠই যদি তাদের চিত্তবিনোদনের শুধুমাত্র উপায় হতো, তা'হলে খুব বেশী দুঃখিত হওয়ার কারণ থাকতো না। কিন্তু তা হয় না। যদিও জানি, শতকরা নব্বুইটি প্রাণীরই জীবনযাত্রা এই কর্মসূচী মেনে চলে, তথাপি বাকী দশজন অন্তত থাকে যারা এই গতানুগতিক ধারায় জীবনকে পরিচালিত করার কথাও ভাবতে পারে না। ভাগ্যিস মাত্র এ-কয়জন লোকও নিজেদের জন্য একটা ভিন্ন পৃথিবী সৃষ্টি করে তুলবার প্রয়াসী হয়, তাই না একটা দেশ, বিশেষত একটা জাতি বেঁচে থাকে। যে নব্বুইটি মানুষ হৈ-হুল্লোড় ক রে বা কিছুই না ক'রে দিন কাটিয়ে দিতে চায় পরিণামে তারা যে-মোক্ষলাভই করুক তাতে জাতির সঞ্চয়ের খাতা একটুও ভরে ওঠে না, অথচ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ঐ দশজন যে যথেষ্ট এ-কথাটা কে-না স্বীকার করবে! কিন্তু সমষ্টির স্রোতোধারা এমনই দুর্নিবার যে তাকে রোধ করা বা তার গতিনির্দেশ করা গোটাকয়েক ব্যক্তির পক্ষে খুব সহজসাধ্য নয়। দুঃখ তো এইখানেই। তবু সান্ত্বনা এই যে সব দেশেই এমন কিছু সংখ্যক মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা স্রষ্টা না হয়েও সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তাকে লালন করে বাহির-বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বার শক্তিতে জোগান দেয়। আপাতভাবে তাদের প্রয়োজনকে স্বীকার না করলেও হয়তো চলে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যে-কোনো সৃষ্টির মূল শক্তিকে বিচার করলে দেখা যাবে, সেখানে শুধু স্রষ্টার ক্ষমতাই যথেষ্ট নয়, তার

পরিপার্শ্বের দ্বিধাহীন সমর্থনই তাকে গড়ে উঠ্‌বার, বেঁচে থাকবার শক্তি দিয়েছে। তা যদি না হতো, কিংবা এমনও যদি হতো যে, যেহেতু মূল সৃষ্টি একজন মানুষেরই হৃদয়-উৎসারিত সেহেতু সে-সৃষ্টির প্রতি কারো কোনো সমর্থন থাক আর না-ই থাক সে তার আপন সামর্থ্যেই বেঁচে থাক্‌বার রসদ যোগাড় করে নেবে, তা হলে সেই স্রষ্টাকেও হয়তো অস্বীকার করা চলতো না, কিন্তু এ-কথা ঠিক যে সে সৃষ্টি যতোই কেন না সার্থক হোক, স্বীকৃতি পেতে হলে তাকে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করতে হত এবং নিরবধি কালের ওপরই হয়তো অবশেষে ভরসা করে থাক্‌তে হতো। অবশ্য এমন কিছু আমি বলতে চাই না যে, প্রত্যক্ষ অভিনন্দনই সার্থক সৃষ্টির মাপকাঠি, আর সাময়িক অবহেলাই তার অসারতা ঘোষণা করে। আমি বলতে চাই, একদিন সেক্সপীয়রের পক্ষে যা ঘট্‌তে পেরেছিলো, দুর্ভাগ্যবশত উনিশ শতকেও হপ্‌কিন্সকে যে সাময়িক ব্যর্থতা বহন করতে হয়েছিলো, বিংশ শতাব্দীর অর্ধেকটা পথ এগিয়ে এসে আমরা যে-শিক্ষা পেয়েছি তাতে এ-দুর্ভাগ্যকে নতুন করে ফিরিয়ে আন্‌বো না। বড় জোর এই হতে পারে যে, আমরা সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে বুঝতে পারবো না; কিন্তু তাঁর অমিতপ্রতিভাকে স্বীকার করবার মতো শিক্ষা আর জ্ঞান কি আমরা আজও আয়ত্ত করতে পারিনি? এর উল্‌টো দিকও যে একটা না আছে তা-ও নয়, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মারাত্মক রূপ নিয়ে যে দেখা দেয় তারও প্রচুর প্রমাণ আছে। কিন্তু তার জন্য কাকে দোষ দেওয়া উচিত ঠিক করে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অসৎ-সৃষ্টিপ্রয়াসের প্রতি বুদ্ধিহীন সমর্থন হয়তো দায়ী, কিন্তু সহজলভ্য করতালির মোহও কি অসৎ শিল্পীর প্রেরণার উৎস হতে পারে না? এ-অবস্থায় দায়িত্বটা কার বেশী নির্ণয় করা শক্ত হলেও আশা করি সাধারণভাবে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে।

স্বভাবতই সাধারণ মানুষ জীবনধারণের অক্লান্ত চেষ্টায় ক্লিন্ন,

অবসন্ন—শিল্পসংস্কৃতির প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ তাদের নেই ; সুতরাং তার প্রয়োজনও যদি তারা তেমন গভীরভাবে বোধ না করে তা'হলে তাদের খুব অপরাধ দেওয়া যায় না—সাধারণ-ভাবে এ-কথা আমরা মেনে নিতে পারি। কিন্তু তার আগে আমাদের এ-কথাও ভেবে দেখা উচিত, মধ্যবিত্ত জীবনের এই-যে অবসাদ তা সর্বদেশে সমানভাবেই লক্ষ্য করা যায় কিনা। প্রত্যক্ষ একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। য়ুরোপের যে-কোনো ভাষায় একটি ভালো বই প্রকাশিত হলে এক বছোরের মধ্যে তার পাঁচটা সংস্করণ শেষ হয়ে যায়, আর বাংলাদেশে সমতুল্য একটি বই-এর প্রথম সংস্করণ শেষ হতেই লাগে পাঁচ বৎসর। তা ছাড়া প্রতি সংস্করণে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যার তারতম্যটাও বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। ইংরেজী ভাষার উল্লেখ আমি ইচ্ছে করলেই করতে পারতাম, কিন্তু তা করিনি এইজন্যে যে, তা হলে একথা সহজেই বলা সম্ভব হবে ভৌগোলিক পরিধিতে সে-ভাষার বিস্তার যতটা দূর-প্রসারী বাংলাভাষার বিস্তার তার শতাংশের একাংশও নয়। কিন্তু ওইটুকু ছোট একটা মহাদেশে আঞ্চলিক ভাষার অন্ত নেই, এবং তাদের অধিকাংশই বাংলাভাষার সংকীর্ণ ক্ষেত্র থেকেও সংকীর্ণতর। তথাপি এ-ব্যতিক্রম। এ-থেকে স্পষ্টতই এ-মীমাংসায় আসা যেতে পারে যে, মধ্যবিত্ত সমাজ বিস্তৃতিতে যত বড়ই হোক তাতে কিছু যায় আসে না, যথাযথ শিক্ষার অভাবে তার হৃদয়ের মুক্তি যদি না ঘটে তা হলে তার পক্ষে সেটাই হবে চরম ক্ষতি। আজ বাংলাদেশে আমরা যে নিশ্চিতভাবে একটা নির্লিপ্ত অবসাদ বয়ে বেড়াচ্ছি, বস্তুত তা এই ক্ষতির বোঝা ছাড়া আর কি! অনুন্নত দেশেও যে গগনস্পর্শী শিল্পসংস্কৃতি গড়ে উঠ্‌তে পারে বাংলাদেশই তার প্রমাণ, কিন্তু সে-শিল্প-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবার মতো উপযুক্ত শিক্ষার মানকেই যদি জাতির বৃহত্তম অংশ স্পর্শ না করতে পারে তা হলে তাদের ওপর সমস্ত অপরাধ চাপিয়ে দেওয়া সুযুক্তির পরিচায়ক নয়। আত্মবিশ্বাসী স্রষ্টা তখন

আক্রোশে নীরব হয়ে থাক্‌বার প্রতিজ্ঞা হয়তো করেন না, তবে এই সার্ধ বিংশ শতাব্দীতেও নিরবধি কালের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো গতিও নেই। সংস্কৃতিপরায়ণ যে-কোনো দেশের পক্ষে তা লজ্জার বিষয় হলেও অনুন্নত দেশে এ-রীতি নিয়তির চেয়েও অপরিহার্য। পক্ষান্তরে, জনসাধারণের সংস্কৃতি-শিক্ষার এই সংকীর্ণতাই অসৎ শিল্পীর কাছে উৎসাহের উৎসস্থল। যথার্থ অর্থে তাদের অধিকাংশকেই শিল্পী বলা ভুল—বস্তুত তাদের সকলেই যশপ্রার্থীমাত্র। শিল্পসাধনায যে নিষ্ঠার প্রয়োজন তার জন্য সামান্যমাত্র শ্রমস্বীকার করতেও তারা পরাঙ্‌মুখ। আসলে নগদমূল্য নিয়ে তাদের কারবার, তাই যত সহজে সম্ভব জনসাধারণের অশিক্ষিত চিত্তবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার দিকেই তাদের নজর। এবং সংস্কৃতিবোধের বালাই নিয়ে যারা মরে না তাদের হৃদয়কে অধিকার করা এইসব শিল্পীর পক্ষে খুব একটা কষ্টকর শ্রমও নয়। কারণ, সাধারণ মানুষ স্বভাবতই যখন গভীরতার দিকে চোখ ফেরাতে চায় না, তখন অন্তুতপক্ষে অবসর-বিনোদনের জন্যেও এইসব শিল্পীর লঘু উপহারকে তারা পরম আনন্দে গ্রহণ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। তাতে ফললাভ এই হয় যে, চরম মূল্য নির্ধারণে এ-জাতীয় অপপ্রয়াসের কোনো দাম না থাকলেও অন্তত নগদ মূল্যটুকু তারা সুদে-আসলেই আদায় করে নেয়। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগতভাবে এ-জাতীয় শিল্পপ্রয়াসীরা যতোই কেন না লাভবান হোক, তারা ব্যাপকভাবে দেশ ও জাতির চরম অপকারই সাধন করে চলে।

বিভিন্ন সাধনার রূপে সংস্কৃতি জাতির মর্যাদাকে বাঁচিয়ে রাখে—সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে। পারস্পরিক তুলনায় এ-কয়টি রূপের মধ্যে হয়তো বিশেষ কোনো পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়, তথাপি, একথা সত্য যে একটা দেশ বা জাতিকে প্রত্যক্ষ ও সোজাসুজি জানতে হলে তার সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানা

যতো সহজ এবং সম্পূর্ণ হয়, সঙ্গীতে বা চিত্রকলার বাহনে জানা তেমন নয়। বাংলাদেশ, ভারতবর্ষও বলা যেতে পারে, এমনই অনুন্নত যে প্রচুর প্রতিভার পরিচয় দিয়েও এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানসাধনায় এমন কিছু দান করতে পারে নি যার নিকষে সে বিশ্ববিজ্ঞানক্ষেত্রে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারে। বাংলাসাহিত্যের সৌভাগ্য এ-নির্মম দারিদ্র্য তাকে ভোগ করতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের ঐশ্বর্যেই আমরা যথেষ্ট ঐশ্বর্যবান। কিন্তু সাহিত্যের ঐশ্বর্যলাভ স্থিতিতে নয়, তার অগ্রগতিতে। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য বলে যাঁদের রচনা আজ চিহ্নিত হয়ে গেছে, অন্তহীন বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, নিজেদের সাহিত্যস্রষ্টারূপে প্রমাণিত করেছেন। তাই একান্ত সাম্প্রতিক কালে যখন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দেখতে হচ্ছে, রবীন্দ্রসমসাময়িক বা রবীন্দ্রোত্তর কালের সেই সাহিত্যিক নিষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত, তখন কেবলমাত্র অ-সাহিত্যিকের ব্যর্থ প্রয়াস আর নগদ মূল্যপ্রাপ্তির মোহকে এবং সাহিত্য-শিক্ষাহীন জনসাধারণের চটুলতাকে গালাগাল দিলেই চল্‌বে না। যে-দেশে সত্যিই একদিন সৎসাহিত্যসৃষ্টি হতে পেরেছে, যে-দেশের সাহিত্যিক নিষ্ঠার অভাব অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্তও ঘটে নি, সে-দেশে হঠাৎ কেন এমনতর অঘটন ঘটতে পারলো তার যথার্থ কারণ উদ্ভাবন করারই চেষ্টা করতে হবে।

এক কথায় বলতে হলে বলা যায়, সামাজিক অবস্থার বিপর্যয়ই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, চিরাচরিত প্রথায় যে সমাজব্যবস্থা চলে আসছিলো আজ তার ভিত্তিমূল টলে উঠেছে বলেই সাহিত্যে এই অবনতির ছাপ পড়েছে। একারণটা আংশিকভাবে উপস্থিত থাকলেও তাই সব নয়। কারণ, প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার মন্ত্র তো হবে বিপ্লবাত্মক, আর সে-মন্ত্র উচ্চারণ করবে যে কাব্য-সাহিত্য তা তো জাতীয় জীবনের উন্নতির

পরিচয়কেই বহন করবে । আজকের দিনের এই রুচিহীন সাহিত্যের পঙ্কিল গলিঘুঁজিতে মাথা গুঁজতে তো চেষ্টা করবে না। এখন তো প্রায় প্রতিটি সাময়িকীর পৃষ্ঠা উল্‌টিয়েই দেখা যায়, সেখানে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে তুলবার প্রাণপন চেষ্টা চলছে। তবে আগাগোড়াই যে যৌনতা এমন কথা অবশ্যই বলা যাবে না। কিন্তু যৌনতালিপ্ত না হলেও যে কোনো রচনা অশ্লীল হতে পারে এ-রচনাগুলোই তার নিকটতম প্রমাণ। অথচ সাহিত্যে যৌনতা যে একান্তই বর্জনীয়, এমন কথা কোনো সমালোচকই কখনও বলবেন না ; আর হাস্যরস যে সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অপরিত্যজ্য বিষয়বস্তু আবহমান-কাল থেকেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা তা প্রমাণ করে আসছেন। তবু আজকের দিনের সাময়িকীগুলোতে এই যে অশ্লীলতা আর চটুল হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস—সেখানে যাই থাক না কেন, এ-সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধরূপেই করা যেতে পারে যে, তার পেছনে বিন্দুমাত্রও সাহিত্য-সৃষ্টির সৎ উদ্দেশ্য নেই, যা আছে তা হলো কাগজ-কালি-কলমের সাহায্যে বিকৃত মনের পরিচয় দেওয়া আর সাধারণ পাঠকমহলের রুচিকেও বিকৃত করে তোলা। সুতরাং নিঃসংশয়েই বলতে পারি, এসব রচনার জন্ম প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গ বা প্রতিবাদ থেকে নয়, নিতান্তই লেখকের ব্যক্তিগত মনোবিকলন থেকে। সমাজ সুস্থিত নয়—সমাজমানসও তাই অসংযত, আজ আর তা কোনোরকম নৈতিক বা সাংস্কৃতিক মূল্যে নিজেকে তৃপ্ত করতে পারছে না।

রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের ফলে সমাজশরীরেরও যে অবধারিতভাবে বিপর্যয় দেখা দেয় এই দেশই তার প্রথম প্রমাণ নয়। য়ুরোপে একাধিকবার এই বিপর্যয়ের পুনরুক্তি ঘটেছে—ফরাসীদেশে জার্মানীতে সবশেষে রাশিয়ায়। বাঙলাদেশের মতো ওই দেশগুলো কোনোকালেই অনুন্নত ছিলো না, তবু দেখা গেছে, এই সাময়িক বিপর্যয়ের পর সেখানকার সাহিত্যও অন্তত কিছুদিনের জন্য নিষ্কলুষ সংস্কৃতিপরায়ণ

হয়ে থাকতে পারেনি। যুদ্ধোত্তর জাপানী সাহিত্যও পঙ্কিলতার আবর্তে হোঁচট খেয়ে পড়েছে—আজো পর্যন্ত সে তার শুদ্ধ শান্ত রূপে ফিরে আসতে পারলো না। এ-নিদর্শনগুলো চোখের সামনে আছে বলেই নয়, রাষ্ট্রিক পরিবর্তনে আমাদের ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় প্রত্যক্ষভাবে যে-পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, আজও হচ্ছে, তাতে কি এমন কথা আমরা অকুণ্ঠায় বলতে পারি না যে, যতোই কেন-না সাময়িক হোক এ-পরিবর্তন আমাদের জীবনে শান্তি আনেনি, স্বস্তি দেয়নি! আমাদের মনের কাঠামো পরিপার্শ্বকে অস্বীকার করে গড়ে ওঠে না। সুতরাং এই রাষ্ট্রিক পটপরিবর্তন যদি আমাদের মন ও মননের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে তা হলে চিরভাগ্যহত আমাদের, বাঙালী মধ্য-বিত্তদের, দোষ দেওয়া যেতে পারে কি? ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, আমরা আশা করবো, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ সুন্দর রূপে সে পৃথিবীর চোখে প্রতিভাত হবে। কিন্তু আজকের এই মুহূর্তে সে তো বিপর্যয়ের অভিশাপকে এড়াতে পারে নি, এ-অভিশাপকে তার বহন করে চলতে হবেই, তা সে যতো অল্পদিনের জন্যেই হোক না। আমাদের দুর্ভাগ্য, এ-বিপর্যয় এসে রুদ্ররূপে দেখা দিয়েছে বাংলাদেশেই—ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে যার দান সবচেয়ে বেশী। স্থিতাবস্থাকে যদি মানতে হয় তবে এই অনাচারকেও মানতে হবেই, তার সমস্ত দোষকে নীলকণ্ঠের মতো পান করা ছাড়া আমাদের আর কোনো গত্যন্তর নেই। নীলকণ্ঠই হতে হবে বৈকি, দেখতে হবে, যে বিষাক্ত হাওয়া আজ আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করে তাকে কলুষিত করে দিয়েছে, সে-যেন জাতীয় জীবনের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে তার মৃত্যু না ঘটায়। বাংলাদেশ এ-দুর্যোগ আরও একবার কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলো, তাই আজো বিশ্বাস করি, যতো দুষ্ট ক্ষতই আমাদের সমাজ শরীরে দেখা দিক আমরা তা নিরাময় করতে পারবোই! অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আমল শেষ হয়ে গেলো, ইংরেজ শাসন (সভ্যতা নয়) পত্তন হ'ল—রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলায় যে-

উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিলো সাহিত্যে তা ঈশ্বরগুপ্তের আগে আর প্রশমিত হলোনা। সেই অন্ধকার আসরে অশ্লীল ভাষায় গীত হলো কবিগান, তরজা, খেউর। রাষ্ট্রিক প্রশান্তির সঙ্গে-সঙ্গে বাংলার চোখে আবার একটি নূতন প্রভাত প্রতিভাত হলো, আত্মস্থ হয়ে বাংলাসাহিত্য বর্জন করতে পারলো সত্ত-অতীতকে, গ্রহণ করতে পারলো আগত সভ্যতাকে। আজও যদি সেই অমার্জিত আর অশ্লীল কবিগানের আসর জমে থাকে বাংলাসাহিত্যের আসরে, তা হলেও আমরা হতাশ হবো না। ইতিহাসের শিক্ষা থেকেই তো জেনেছি, যে-কোনোপ্রকার দুর্যোগেই সামাজিক বা রাষ্ট্রিক জীবন মুমূর্ষু হয়ে পড়ুক না, বাংলার মানসিক স্বাস্থ্য একদিন ফিরে আসবেই।

এ-বিশ্বাস ছাড়াও যুক্তিনির্ভর আরও একটি কারণ তো আমাদের হাতের কাছেই আছে। রাষ্ট্রের বিবর্তনের ফলে সাহিত্যধারার অধোগতি যদি অবধারিতও হয়, তথাপি আমরা, আজকের দিনের পাঠকরা বা কেন উনিশ শতকী পঙ্কিলতায় গা ভাসিয়ে দেবো? সেদিন অবশ্য পাঠকদের এ-ছাড়া আর কিছু গ্রহণযোগ্য ছিলো না। কিন্তু আমরা আজ সেই অশ্লীল ভাঁড়ামি আর চটুল হাস্যরসে সন্তুষ্ট থাকবো কেমন করে? তাদের চেয়ে আমাদের সঞ্চয় কি অনেক বেশী নয়। বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ সংঘটিত হয়েছে আমাদের, আমরা চিনেছি সাহিত্যের স্বরূপ—আর সবচেয়ে বড়ো কথা, হাতের নাগালের মধ্যেই পেয়েছি আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র, প্রথম চৌধুরীকে। তা হলে কেমন করে বিশ্বাস করবো, উনিশ শতকী পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে আজও আমাদের ঘুরপাক খেয়ে মরতে হবে। রাষ্ট্রিক বিবর্তন ব্যবহারিক জীবনে অনেক পরিবর্তন আনতে পারে, তার চাপে দুর্বিসহও হয়ে উঠতে পারে আমাদের ব্যক্তিসত্তা, কিন্তু সাহিত্যশিক্ষায় সচেতন হয়েও কি সামান্য তৃপ্তির প্রলোভনে আমরা এইসব আবর্জনাকেই প্রশ্রয় দেবো?

সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও, তাই, আমাদের কর্তব্য ফুরিয়ে গেলো না। শান্তির অপেক্ষায় যদি বসে থাকতে হয় তা' হলে দুর্ভাগ্যকেই ডেকে আনতে হবে, সাহিত্যসংস্কৃতিকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি আমরা এ-বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠি, তা হলে কেবলমাত্র আমাদের, বাংলাসাহিত্যের পাঠকদেরই দায়িত্ব-বোধকে জাগিয়ে রাখলে চলবে না, সেই সঙ্গে এসে হাত মেলাতে হবে সাহিত্যশিল্পীকেও। তা না হলে অসম্পূর্ণ হবে আমাদের প্রচেষ্টা। হয়তো আমাদের আজ অবসর কম, হয়তো সহজ আনন্দলাভের প্রলোভনেই আমরা বারবার সাড়া দিতে চাইবো, তবু সাহিত্যের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই ক্ষণিক অবসরকেও আমাদের কাজে লাগাতে হবে, গভীরতর সাহিত্যের দিকে নিয়োগ করতে হবে মনকে। তা যদি পারি, তা হলে যাঁরা আজ আমাদের এই ক্ষণ-দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সস্তা হাততালি কুড়িয়ে নিচ্ছেন তাঁরা সচেতন হতে বাধ্য হবেন, অপসাহিত্য সৃষ্টি করে প্রবহমান স্রোতোধারাকে পঙ্কিল করে তুলবেন না।

সাহিত্যে সাময়িকতা

একাধিক বিশ্ববিশ্রুত সমালোচকের উক্তি উল্লেখ করে প্রমাণ করা সম্ভব যে, সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো মত প্রকাশ করা অসম্ভব না হলেও যথেষ্টই কঠিন। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, কারণ, সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই এ-কথাটা অত্যন্ত সহজে বোঝা যায় যে, সমসাময়িক কালটা যদিও চোখের ওপর দিয়ে একান্ত প্রত্যক্ষভাবেই প্রবহমান, তথাপি তার সবটাই মনের মধ্যে অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে যায় না। প্রবাহ থেকে বিশেষ কিছুকে ভিন্নভাবে লক্ষ্য করতে হলে, কিছুটা কালের ব্যবধান চাই, সহজ প্রত্যক্ষ থেকে সব সময়েই প্রত্যয় জন্মে না। ঠিক তেমনি, আজকের দিনের কোনো একজন লেখক সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়াও কঠিন। তাঁকেও ভিন্নভাবে একটু দূর থেকে লক্ষ্য করতে না পারলে দৃষ্টি ভ্রান্ত হতে পারে। তারও কারণ খুব সহজেই অনুমেয়। প্রথমত, কোনো রচনাকার তাঁর নিজেরই পূর্ণ পরিণতিকে প্রকাশ করতে সময় নেন দীর্ঘকাল ; দ্বিতীয়ত, স্থায়িত্বের মাপকাঠিতে তাঁর রচনার মূল্যায়নও প্রয়োজন। শুধু এ-দুটো কারণকে একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, যে-কোনো কালে আধুনিক লেখকেরা যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিলেও অনেকখানিই অবজ্ঞাত হয়ে থাকেন কেন! এমন প্রমাণ অবশ্য কিছু-কিছু আছে, দীর্ঘ জীবনের অধিকারী না হয়েও কোনো-কোনো কবি বা সাহিত্যিক এমন দুর্লভ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন যে সুদূর ভবিষ্যৎ কালে কালে তাঁদের স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছে। কিন্তু এ-ঘটনা সে-সব দুর্লভ প্রতিভার মতোই দুর্লভ। সুতরাং ব্যতিক্রম হিসেবে তাঁদের কথা যদি বাদ দিই, তাহলে

শিল্পকর্মের মূল্যনির্ণয়ে কারো মনে কোনো ভুল ধারণা স্থান পাবে না। এ-সম্বন্ধে দু'একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। চিত্রশিল্পে রাফায়েল, টিন্‌টরেটো বা গার্টিনের মতো স্বল্পায়ু শিল্পসাধক যেমন বেশী নেই, সাহিত্যেও তেমনি শেলী, কীটস্‌, চ্যাটারটনের সংখ্যাও অল্প। অথচ প্রতিষ্ঠাকে অর্জন করবার জন্য দা'ভিঞ্চি, মাইকেল আঞ্জেলো, টার্ণারকে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে হয়েছিলো ; এমনকি তার চেয়েও করুণাঘন ঘটনা এই যে, নবযুগের প্রবর্তক হওয়া সত্ত্বেও কনস্টেবল আর হুইস্‌লার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিজেদের চিত্রশিল্পকে ব্যর্থ বলেই জেনে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ আর গ্যেটে অজস্র লিখেছেন দীর্ঘজীবনে, অথচ মনে হয়, এত রচনাও বুঝি তাঁদের যথার্থ প্রতিভাকে প্রকাশ করতে পারেনি। হপ্‌কিন্স্‌ সৎকবি ছিলেন এ-সংবাদ আবিষ্কৃত হয়েছিলো তাঁর মৃত্যুরও বহুকাল পরে। সঙ্গীতশিল্প সম্বন্ধে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না. ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর মুখে শুনেছি, আজও নাকি তাঁর শিক্ষার শেষ হলো না। এ তাঁর বিনয় হতে পারে, কিন্তু তাঁর শিল্পীসুলভ সততা সর্বজনবিদিত। অথচ, সঙ্গীতজগতে তিনি বিংশ-শতাব্দীর এক পরম বিস্ময়। বিতোফেন বা মোজার্ট যদি শেলী কীট্‌সের আয়ু নিয়ে জন্মাতেন. তবে তাঁদের নাম আমাদের কাছে এসে পৌঁছতো কিনা সন্দেহ। অন্যপক্ষে য়ুরোপীয় রেনেসাঁর যুগবিপ্লবী শিক্ষাগুরু ইরাসমুসের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল অনেক। জীবনশিল্পী মাত্রেরই দীর্ঘজীবন কাম্য, কাম্য এইজন্য যে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার আগে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তা হেলায়ফেলায় কখনও আয়ত্ত হয় না। অল্পকালে নিজেকে কেউ প্রস্তুত করে তুলতে পেরেছেন, এমন সাক্ষ্য ইতিহাস দেয় না। সাময়িক সৃষ্টি দ্বিতীয় যে কারণে সহজেই সর্বজনগ্রাহ্য হয় না, তার জন্য সর্বাংশে শিল্পীকুল দায়ী নন। তাঁদের দানকে গ্রহণ করবার মতো উপযুক্ত শিক্ষা জনসাধারণকে আয়ত্ত করে নিতে হয় অনেক আয়াসে, সুতরাং ধীরে ধীরে। অথচ সৃষ্টিপ্রবাহ কারো মুখের

দিকে তাকিয়ে ক্ষণে ক্ষণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মধুসূদন তখনকার বাংলাদেশের পক্ষে এমনিই আকস্মিক যে তাঁকে ভালোমতো বুঝবার আগেই তিনি চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আমরা কি আজও রবীন্দ্রনাথকে ঠিকঠিক জানতে পেরেছি। কত শতাব্দী পার হলো, আজও শেকস্পীয়রের আবিষ্কার শেষ হলো না। সাধারণের পক্ষে ক্লাশিক-শব্দের সহজবোধ্য অর্থ আর্নল্ড্ বেনেট এই করেছিলেন, যে-সাহিত্য কালের আঘাত বারবার সহ্য করেও জীর্ণ হলো না আমরা তাকেই ক্লাশিক আখ্যায় সম্মান দিই। এই ব্যাখ্যাটুকুকেও যদি আমরা স্বীকার করে নিই, তাহলেও বলা যায়, অন্তত একপুরুষ উত্তীর্ণ না হলে কোনো শিল্পকথাকে চিন্তে পারা অসম্ভব। আর যদি ক্লাশিকের ব্যাখ্যার জন্য টি. এস. এলিঅটের কাছে হাত পাতি, তবে দেখবো, বিপুলা পৃথ্বী এবং নিরবধি কালই তার বিচারক, অন্তত সমকাল তো অবশ্যই নয়। তার ওপর সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাস তো অনবরত এই সাক্ষ্যই দিয়ে আসছে যে, এককালে যে কবি বা সাহিত্যিক খ্যাতির চূড়া স্পর্শ করেছেন, ভিন্নতর যুগে তিনি প্রায় অনুল্লিখিত। একমাত্র শেলীর সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে কত সমালোচক তো কতরকম রায়ই দিলেন। শেকস্পীয়রই কি বাদ গেছেন? তাঁকে খ্যাতির উচ্চ শীর্ষ থেকে হয় তো কখনও নামিয়ে আনা সম্ভব হয়নি, কিন্তু এ কথা তো ঠিক যে বারবার তাঁকে এসে দাঁড়াতে হয়েছে সমালোচনার সামনে, কত বিরুদ্ধ আলোচনাকেও সহ্য করতে হয়েছে তাঁর সাহিত্যকে। সুতরাং ক্লাশিক বলতে আমরা যে অর্থই বুঝি না কেন, আমরা অন্তত একথা বলতে পারি যে, সাহিত্য পুরনোই হোক আর সমকালীনই হোক, সাধারণ পাঠকজনের চিরকালের রুচি এবং আদর্শকে যে রচনা উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তারই মূল্য সত্যিকারের সাহিত্য হিসেবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পাঠকের রুচি কেমন করে গড়ে ওঠে। বেশী দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করলেই এ প্রশ্নের

একটি সহজ মীমাংসা হাতের কাছে পাওয়া যেতে পারে। আমরা জানি, যদিও ইতিপূর্বে মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সাহিত্যপ্রাঙ্গণ পুষ্পেপত্রে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছিলেন, তথাপি তাঁদের কারো সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের মিল ছিল না, আত্মিক বা মানসিক কোনো দিক দিয়েই নয়, সাহিত্যিক রূপে তো নয়ই। অথচ আজ দেখছি, আমরা তাঁদের তিনজনকেই মেনে নিয়েছি, আমাদের রুচি তাঁদের সাহিত্যকে গ্রহণ করতে একটুও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এই মীমাংসায় আমরা বড় সহজে এসে পৌঁছাইনি। বঙ্কিমচন্দ্রকে সহজে গ্রহণ করার মূলে বাঙালী পাঠকের মনে যে কারণ ছিলো, মধুসূদনের বেলায় তা ছিল না। তার আগে পর্যন্ত বাংলার পাঠককুল আপ্লুত হয়েছিল মঙ্গলকাব্যের একঘেয়েমিতে অন্যদিকে নতুন ইংরেজি শিক্ষা দিয়েছে আধুনিক জীবনচেতনা সম্বন্ধে একটা রোমান্টিক কৌতুহল। তাই বঙ্কিমসাহিত্য প্রায় রাতারাতিই বাংলার পাঠকদের হৃদয় জয় করে নিল। কিন্তু মধুসূদনের পক্ষে এমনটি আর ঘটে উঠতে পারেনি। প্রথমত মঙ্গলকাব্যের একঘেয়েমির মধ্যেও যে অভ্যাস দানা বেধে ছিল, তার জট খোলা অল্প সময়ের ব্যাপার নয় তার, ওপর ইংরেজি শিক্ষা যতই রোমান্স এনে দিক বাংলার জনমানসে, সমগ্র য়ুরোপের কাব্যসুধাকে একাধারে পান করবার মতো শক্তি বা সময় কোনোটাই তার তখন ছিল না; এবং আরো মর্মান্তিক ঘটনা এই যে, মধুসূদন একে তো প্রস্তুত হওয়ার মত অজস্র সময় আমাদের দিলেনই না, অধিকন্তু অত্যন্ত সাবধানে রোমান্স-কে ব্যবহার করলেন তাঁর সাহিত্যে। ফলে এত বড় প্রতিভাকে প্রত্যক্ষ করেও হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল বাংলা-দেশের। কিন্তু সর্বকালের সর্বদেশের পক্ষেই একটা সান্ত্বনার কথা এই যে, এমন কয়েকজন স্বচ্ছদৃষ্টি প্রতিভা থাকে সমকালেই, যাঁদের চোখ ঠিক-ঠিক জিনিসটি চিন্‌তে পারে পাকা জহুরীর মতো। তাই একটু

দেরীতে হলেও মধুসূদন স্বীকৃত হলেন। কিন্তু এই শর্তটুকু পাঠকদের পালন করতেই হলো যে, মধুসূদনের রচনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আগে নিজেকে শিক্ষিত করে নিতে হবে। এবং অবশেষে আশ্চর্য হয়ে দেখা গেল, আমরা মধুসূদনে যেমন মুগ্ধ, তেমনি মুগ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রেও। দুই লেখকের মধ্যে রুচি এবং আদর্শের এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের রচনার রসকে গ্রহণ করতে গিয়ে সে-পার্থক্য লুপ্ত হয়ে গেল কি করে পাঠকদের মন থেকে? তারই শেষ উত্তর পাবো আমরা রবীন্দ্রনাথে। বাংলা তথা ভারতবর্ষের মতো অনুন্নত দেশের পক্ষেই নয়, সাম্রাজ্যবাদী যুযুধান একটি যুগের পক্ষেও রবীন্দ্রনাথ মূর্তিমান বিদ্রোহ। প্রথম দিকে তাঁর অমিত আলোয় যে আমরা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, তার জন্য তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবটাই দায়ী ছিল না, দায়ী ছিল আদর্শচ্যুত ভারতবর্ষের দীনতা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে ভারতীয় ঐতিহ্যকেই প্রকাশিত করতে চেয়েছিলেন, অথচ তাঁরই দেশের লোক সে গোপন সংবাদটি জানতে চেষ্টা করেনি কখনও। তার কারণ, দীর্ঘ শতাব্দীব্যাপী পরদাসত্বের অভিশাপে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো ভারতবাসীর সামনে। সে দুয়ার যদিবা উন্মুক্ত হলো, পথপ্রদর্শককে ভুল বুঝলো ঐতিহ্যজ্ঞানহীন সাধারণ জন। এতো গেলো আদর্শের দিক। সাহিত্যের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ব্যতিক্রম ছিলেন প্রাক্তন দুজন যুগন্ধর রচনাকারদের থেকে। মনে ও মননে তাঁর পথ ছিল ভিন্ন। তাই বঙ্কিম-মধুসূদনে অভ্যস্ত পাঠককুল, বিশেষত সমালোচকেরা ক্ষমা করতে পারেননি সেদিন রবীন্দ্রনাথকে। সে তিক্ততার আভাস পাওয়া যাবে প্রমথ চৌধুরীর উত্তরে। আমাদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে, দীর্ঘ জীবনের বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমস্ত ভ্রান্তি দূর করার দায়িত্ব নিলেন নিজের হাতে। অজস্র রচনার মধ্য দিয়ে তিনি উন্মুক্ত হলেন ধীরে ধীরে। তাঁকে যে সবটাই জান গেছে এমন অসম্ভব সিদ্ধান্ত করা

অন্যায় হবে সন্দেহ কি, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের আস্বাদনে তৃপ্ত হয়নি এমন বাঙালী কি পাওয়া যাবে একজনও। অথচ রবীন্দ্রনাথ যেমন বঙ্কিম-মধুসূদনেরই উত্তরসাধক, আমরাও তেমনি কালে-কালে এ-তিন জনেরই রসভোক্তা।

শিল্পস্রষ্টার দীর্ঘজীবন চাই সুসমঞ্জস পরিণতির প্রয়োজন, আর সেই পরিণতিকে যথার্থ রূপে অনুধাবন করার সাধনায় সাধারণের রুচি ও আদর্শের জন্য চাই পরম তিতিক্ষা। এ দুয়ের সার্থক মিলন যেখানে, সেখানে ভ্রান্তির পথ রুদ্ধ, সামগ্রিক আদর্শের মুক্তি অনিবার্য। তাই শেকস্‌পীয়রের দুর্ভোগ ভুগতে হয় না বার্ণার্ডশকে, এমন কি সেদিনকার মতো সংস্কারাচ্ছন্ন রাশিয়ায়ও টলস্টয়কে। বিশ শতকীয় সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখী দাঁড়িয়েও অন্তত এ গর্ব করার অধিকার পেয়েছে, শিল্প-সংস্কৃতির সাময়িকতাকে দ্বিধাশঙ্কায় বিপন্ন হতে সে দেবে না। সমকালীন অস্পষ্টতা প্রত্যক্ষ যদি না-ও হয়, তথাপি যুগের শিক্ষা থেকেই আমরা জেনেছি, তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আজ যা অপূর্ণ, আমাদের আকাঙ্ক্ষাই তাকে পূর্ণতা দেবে।